বিকেলের মৃত্যু

মাহবুবুর শাহারিয়ার

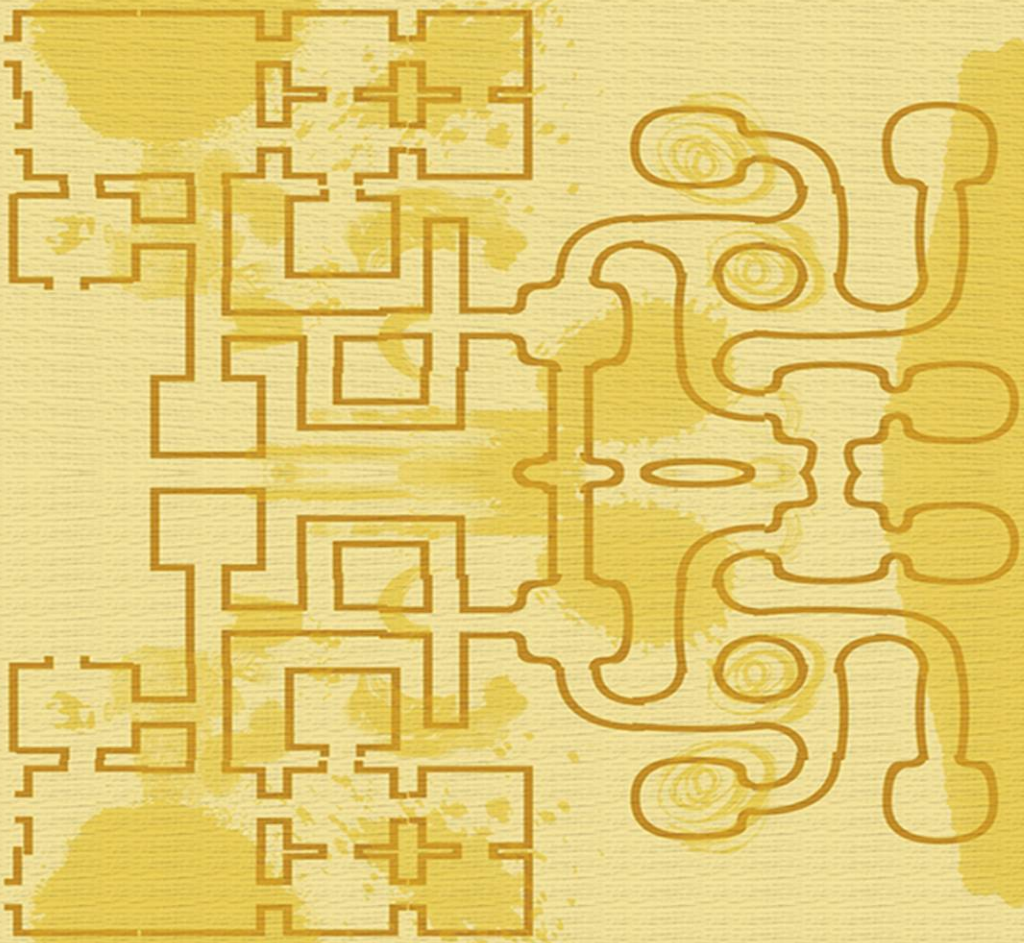

বিকেলের মৃত্যু

মাহবুবুর শাহরিয়ার

উপন্যাস
প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্রকাশকঃ বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
© স্বত্বঃ মাহবুবুর শাহরিয়ার
প্রথম সংস্করণ

উৎসর্গ

যাদের উৎসর্গ করতে যাচ্ছি তাদের একজন বাদে অন্যরা কেউ বইয়ের ভক্ত নয়, আমি জানি। গল্প উপন্যাস পড়তে তারা কেউ ভালোবাসে না। এ বইটাও তারা হয়তো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়বে না। অথবা হয়তো পড়বে, ঠিক জানি না। তবে পড়লেও মনে রাখবে কিনা সে নিয়ে ঢের সন্দেহ রয়েছে। তবু তাদেরকে উৎসর্গ করার কারণ হচ্ছে এ বইটার জন্য তারাই সবচেয়ে বেশি দাবি করতে পারে।

স্বল্পবাক কিন্তু জ্ঞানী কথা বলা **টুটুল**
একজন সুখী মানুষ **আরিফ**
গল্পবাজ **এরশাদ**
বোম্বা **মাহবুব**

আমার এক সময়কার চার বন্ধু
এক জীবনের অনেকটা সময় যারা আমার সাথে নষ্ট করেছিলো

ভূমিকা

এ এক অদ্ভুত সময়ের গল্প। বড় আশ্চর্য সে সময়, যখন মানুষ পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শেয়ার বাজার নিয়ে। কতো কাহিনী, কতো ঘটনা ঘটে গেলো সে সময়। বিচিত্র সব ঘটনা। কোনো ঘটনা শুনে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়, আবার কোনো ঘটনা শুনে বিস্ময় জাগে- এমনও হয়? আবার কতো হাহাকারের কাহিনীও লেখা হয়ে আছে সেই সময়ের পাতায়।

এই উপন্যাসের কিছু কিছু ঘটনা সত্যি সত্যি ঘটেছিলো, হয়তো যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই অথবা একটু সেদিক ভাবে। কিছু ঘটনা আমি নিজে দেখেছি, কিছু অন্যদের কাছে শুনেছি। যে আশ্চর্য সময়ের কথা আমি বলতে চেয়েছি, তার সব হয়তো বলতে পারিনি। তবু এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সেই আশ্চর্য সময়কে কিছুটা যদি বোঝা যায়, মন্দ কি?

মাহবুবুর শাহরিয়ার
mshahriar@gmail.com

এক

আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম মালিবাগ মোড়ে। আমরা মানে আমি আর আমার বন্ধু মুন্না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে মতিঝিল যাওয়া যায় তাই নিয়ে আমরা খেঁকাখেঁকি করছিলাম। বোঝাতে কি ভুল করলাম? আসলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মতিঝিল যেতে চাচ্ছিলাম না, দাঁড়িয়ে থেকে মতিঝিল কিভাবে যাওয়া যায় সেটা আলোচনা করছিলাম। ওহো, আমি বোধহয় আবার গুলিয়ে ফেলেছি! আমরা আসলে ওটা চাইনি, মানে দাঁড়িয়ে থেকে কোথাও যেতে চাইনি। দাঁড়িয়ে থেকে কোথাও কিভাবে যাওয়া যায় আমরা জানি না। আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে মতিঝিল যেতে, আর কিভাবে, বা কিসে করে মতিঝিল যাওয়া যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা সেটা নিয়ে আলাপ করছিলাম।

আমরা স্কুটার নিতে পারতাম। কিন্তু স্কুটার আমার পছন্দ না। স্কুটার অতিরিক্ত শব্দ করে, ওটার পিছন দিয়ে ঝাঁঝালো বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয়। যতবার আমি স্কুটারে উঠেছি ততবার ওটার ক্যাট ক্যাট শব্দে আমার মাথা ধরে গেছে, ধোঁয়ার ঝাঁঝালো গন্ধে আমার চোখ মুখ জ্বলতে শুরু করেছে। প্রত্যেকবার স্কুটার থেকে নামার পর আমি অভিশাপ দিয়েছি যেনো শিগগিরই সেটা উল্টে যায়। তিন চাকার এই যানবাহনটার মধ্যে উল্টে যাবার একটা প্রবণতা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। যে কোনো ছুতোয় সুযোগ পেলেই এটা উল্টে যায়। উল্টে গিয়ে নিজের বাজে চাকাগুলো আকাশের দিকে তুলে গুবরে পোকার মতো চিত হয়ে পড়ে থাকে। সেটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা। কোনো স্কুটারকে কখনো সোজা অবস্থায় দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না।

স্কুটারের এমন উল্টে যাবার ঘটনা একবার আমি সত্যি সত্যি দেখেছিলাম। সেদিন আমি অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। আগের রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই; ভোররাতে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে আতঙ্কে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলাম যে ভয়ংকর ঘটনাগুলো আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমার কিছুক্ষণ সময় লাগলো ধাতস্থ হতে। তারপর ঘটনাগুলো

যে বাস্তবে ঘটেনি এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম আমি বিলকুল সব ভুলে গেছি, কিছুই মনে করতে পারলাম না। অথচ স্বপ্নের ভয়াবহতায় তখনো আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। তখন আমি বিছানা থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ছাদের কোনায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সুন্দর এক ভোরের সূচনা হচ্ছে। চারদিকে আশ্চর্য মায়াবী আলো। একটু আগে দেখা স্বপ্নের ভয়াবহতা, ভোরের ঝিরি ঝিরি ঠাণ্ডা বাতাস আর সেই মায়াবী আলো যুক্তি করে আমার মনটাকে দ্রবীভূত করে ফেললো। সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে শুভ চেতনা জাগ্রত হলো। মহৎ অনুভূতিতে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। আমি অনুভব করলাম, জীবনটা অলস ভাবে শুয়ে বসে হেলায় কাটিয়ে দেবার জন্য নয়। জীবন কোনো অবসরের গান নয়। জীবনের উদ্দেশ্য অনেক বড়, অনেক মহান। দুর্লভ এই মানব জন্ম। এই দুর্লভ জীবনে আমাদের সবাইকে সেই মহান উদ্দেশ্যের দিকে হাঁটতে হবে।

গভীর শুভ চেতনায় আমার মন দ্রবীভূত হয়ে গেলো। এরকম শুভ চেতনার মুহূর্তে আমি সব সময় যা করি, গায়ে একটা শার্ট চাপিয়ে বের হয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা নিরিবিলি ভোরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ঠিক করলাম, জীবনটাকে পাল্টে ফেলবো। জীবনে আর কখনো আলসেমি করবো না। আমি সব সময় যেটা করি, কাজগুলো 'এই তো এখনি করে ফেলবো; করে ফেললেই শেষ হয়ে যাবে!' ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে জমা করি। অনেক কাজ জমে যাবার পর হতাশ চোখে সেগুলোর দিকে চেয়ে থাকি- 'ইস, সময় মতো এগুলো করলে কবে শেষ হয়ে যেতো! এখন এতো কাজ শেষ করবো কি করে?' ভাবতে ভাবতে আমি আর কাজগুলো করি না। আমি তখন বসে বসে জমা হয়ে থাকা কাজগুলোর দিকে চেয়ে থাকি। চেয়ে থাকতে থাকতে কাজগুলো কিভাবে করবো, করার পর কেমন হবে সেটা ভাবতে আমার আনন্দ লাগে। কাজগুলো শেষ করা মাত্র কেমন পাল্টে যাবে সব, কেমন হৈ চৈ পড়ে যাবে সেটা ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ বোধ করি। তারপর এক সময় সেই আত্মপ্রসাদ নিয়ে মনের আনন্দে আমি ঘুমাতে যাই।

না, আর আমি এরকম করবো না। এখন থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটা নতুন, সুন্দর জীবনের সূচনা করবো। কোনো পাপ কর্ম করবো না। মানুষের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করবো না। তাদের সাথে সব সময় সহৃদয়তা পূর্ণ মধুর ব্যবহার করবো। তারা আমার সাথে বদমায়েশি করলেও (যেটা তারা অবশ্যই করবে বলে আমার ধারণা) আমি তাদের প্রতি সদয় থাকবো। পৃথিবীর মানুষগুলো এমনিতেই দুখী। আমার কর্ম দিয়ে আমি তাদের

দুঃখগুলো বাড়াবো না।

এসব ভাবতে ভাবতে আমার মধ্যে মহত্ত্ব জেগে উঠলো। আমি মহৎ কোনো কাজ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সেই মুহূর্তে আমি আমার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের যাবতীয় শয়তানী ক্ষমা করে দিয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করলাম। আমি আশা করলাম তারা আমার এই মহৎ অনুভূতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিজেরাও অনুপ্রাণিত হয়ে একইরকম মহত্ত্বের অনুসারী হবে। কিন্তু তারা আমার এই শুভ চেতনা সম্পর্কে কিছুই না জেনে নিজেদের শয়তানি অব্যাহত রাখলো। কিন্তু আমি তাদের ক্ষমা করলাম ঠিকই এবং ক্ষমা করে আমার ভালো লাগলো। মহৎ চেতনায় উজ্জীবিত আমি হাঁটতে হাঁটতে মালিবাগ মোড়ে এসে দাঁড়ালাম।

অতো সকালে মোড়টা ঠিকমতো জেগে ওঠেনি, সে কেবল দিনের শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছু মানুষ প্রাতঃভ্রমণে যাচ্ছে, কেউ কেউ নামাজ পড়ে ফিরছে। ফুটপাতের চায়ের দোকানগুলো নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছে। একটা দুইটা করে রিকশা এসে মোড়ে জমা হচ্ছে। সেই সময় দেখলাম একটা স্কুটার ক্যাট ক্যাট করতে করতে খুব জোরে ছুটে আসছে। তীব্র গতিতে ছুটে এসে স্কুটারটা ডান দিকে বাঁক নিতে গিয়ে মোড়ের ঠিক মাঝখানে গিয়ে উল্টে গেলো। উল্টানো স্কুটারটা বিকট আওয়াজ করতে শুরু করলো আর তার চাকাগুলো আকাশের দিকে চেয়ে বো বো করে ঘুরতে লাগলো।

প্রথমে আমি ব্যাপারটা ভালো করে বুঝলাম না। স্কুটারটা ছুটে এসে এমন সুন্দর আলতো ভাবে উল্টে গেলো যে আমি ভাবলাম সেটা বোধহয় দূর থেকে ছুটে এসে শৈল্পিক ভঙ্গিতে উল্টে যাওয়া চর্চা করছে। হয়তো এটা নিয়ে তার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে, এভাবে হয়তো সে গিনিস রেকর্ড বইতে নাম লেখাতে চায়। কিন্তু যখন উল্টে যাওয়া স্কুটারের ভিতর থেকে সেটার চালক হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলো, আর সে বেরিয়ে এসে স্কুটারের পিছন থেকে মোটা এক মহিলাকে টেনে বের করে আনলো, তখন আমার ভুল ভাঙলো। সেই মহিলা বের হয়ে এসে চালকের গলা চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করলো। সে কি চিৎকার! সেই চিৎকারে আশেপাশের বাসার লোক ঘুম থেকে জেগে উঠে কেয়ামত শুরু হয়েছে ভেবে ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। তাদের ধারণা হলো যে শেষ বিচারের দিন এসে গেছে আর বিকট শব্দটা হচ্ছে ইসরাফিলের শিঙ্গার শব্দ। তারা আতঙ্কিত হয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে যখন তারা দেখল যে কেয়ামত শুরু হয়নি, ইসরাফিলের শিঙ্গার শব্দ বলে তারা যা ভেবেছিল সেটা আসলে মোটা এক মহিলার চিৎকার, তখন

তারা স্পষ্টতই হতাশ হলো।

এই ঘটনার পর স্কুটার উল্টে যাওয়া দেখার জন্য বহুবার আমি পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। দুঃখের বিষয় এমন ঘটনা আমি আর কখনো দেখতে পাইনি, যদিও আমি জানি যে কোথাও না কোথাও সেগুলো ঠিকই উল্টাচ্ছে। উল্টে যাওয়া ছাড়া স্কুটারের আর কাজটা কি? সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে স্কুটারের উল্টে যাওয়া দেখতে আমার ভালো লাগে। রাজকীয় ভঙ্গিতে ছুটে এসে যেমন চট করে সেটা উল্টে যায় তা সত্যিই দর্শনীয়। তবে উল্টে যাওয়া স্কুটারের যাত্রী আমার সাথে একমত হবে বলে আমি মনে করি না।

মালিবাগ মোড় থেকে মতিঝিল খুব বেশি দূর না, আমরা রিকশা করেও যেতে পারতাম। রিকশা চড়া আমার কাছে সব সময় উত্তেজনাপূর্ণ একটা ব্যাপার বলে মনে হয়। রিকশা চড়ার প্রতি পদক্ষেপে উত্তেজনা। এই উত্তেজনা শুরু হয় একদম গোড়া থেকে, রিকশা ভাড়া করা থেকে শুরু করে। প্রথমেই রিকশাগুলো এমন ভাড়া চাইবে যে আপনার পিলে চমকে উঠবে; আপনি অবাক হয়ে যাবেন। নিজেকে সামলাতে একটু সময় লাগবে আপনার; তারপর আপনি বলবেন যে ঐ ভাড়ায় তো স্কুটার নেয়া যায়, ঐ ভাড়ায় যেতে হলে স্কুটারে যাওয়াই ভালো। রিকশাটা তখন আপনাকে স্কুটার নিতে পরামর্শ দিবে। তার পরামর্শ আপনার পছন্দ হবে না কারণ আপনি কম ভাড়ায় যেতে চান, আর বদমাশ রিকশাটাও আসলে ন্যায্য ভাড়া চায়নি। ফলে আপনার মাথা গরম হয়ে উঠবে আর একটু পরে মেজাজ হারিয়ে আপনি গালাগালি শুরু করবেন। আপনার হাতে যদি ছাতা থাকে তাহলে দেখা যাবে আপনি ছাতা হাতে রিকশাগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আপনি একটা রিক্সা পাবেন যেটার ভাড়া আপনার পছন্দ হবে। তখন আপনি রিকশাটায় উঠে বসবেন এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখবেন ইতিমধ্যে সময় চলে গেছে আধা ঘণ্টা।

চলতে শুরু করেই আপনার রিকশাটা সামনের রিকশাকে ওভারটেক করার চেষ্টা করবে আর এটা করতে গিয়ে সে সামনের রিকশার পিছনের বল্টুর সাথে নিজের পিছনের বল্টুটা বাঁধিয়ে দিবে। পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে রিকশা দুটো তখন দাঁড়িয়ে পড়বে এবং নিজেদের ছাড়িয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টা না করে সিটে বসে পরস্পরকে দোষারোপ করবে আর শক্ত শক্ত গালি দিতে থাকবে। সেইসব ইঙ্গিতময় অর্থপূর্ণ গালি শুনে আপনার কান গরম হয়ে উঠবে, এই সমস্ত গালির অর্থই আপনি জানেন না এমন একটা ভাব করে আপনি আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকবেন। ইতিমধ্যে আপনার পিছনে একটা ভিড় জমে উঠবে। পিছন

থেকে অন্য রিকশাগুলো এই রিকশা দুটোকে গালি দিবে। পথচারীরা আপনার রিকশার উপর দিয়ে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে থাকবে আর পিছনের গাড়িগুলো ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিবে। পরিস্থিতি যখন চরমে উঠবে তখন কেউ একজন এসে আপনার রিকশাঅলাকে চড় মারবে। রিকশাঅলা তখন কিছুই হয়নি এমন নির্বিকার মুখ করে রিকশা থেকে নেমে গিয়ে অন্য রিকশা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করবে। মোড়ের কাছাকাছি গিয়ে আপনার রিকশাটা দেখবে যে বিরাট জ্যাম পড়ে আছে। তখন সে শান্তভাবে জ্যামের পিছনে লাইন না দিয়ে জ্যামের মধ্যে একটু খানি ফাঁক খুঁজে বের করে তার মধ্যে নিজের লম্বা নোংরা নাকটা গলিয়ে দিবে। জ্যামের মধ্যে বসে আপনি দেখবেন যে গত আধ ঘণ্টায় আপনার রিকশাটা দু ইঞ্চিও এগোয়নি। আপনি বসে বসে ভাববেন যে রিকশা না নিয়ে হেঁটে গেলেই ভালো হতো। এরকম অবস্থায় মোড়ে দাঁড়ানো ট্রাফিক পুলিশটার মনে হবে যে জ্যামটা ছাড়ানোর জন্য তার কিছু করা দরকার, এটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সে তখন লোহার একটা সুচালো জিনিস নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং আপনার রিকশার চাকায় জিনিসটা ফুটিয়ে দিয়ে হাওয়া বের করে দিবে।

কিছুক্ষণ বৃষ্টির পর রিকশা চড়া সত্যিই উত্তেজনাকর হয়ে দাঁড়ায়। পনেরো-বিশ মিনিটের ঝুম বৃষ্টির পর রাস্তাগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। রাস্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গর্তগুলোকে তখন দেখা যায় না আর রিকশাগুলো পানিতে ডোবা রাস্তায় মনের আনন্দে চলতে গিয়ে কোনো একটা গর্তের মধ্যে চাকা ঢুকিয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ে যায়। রিকশার আরোহী যদি লাফালাফিতে দক্ষ হয় তাহলে সে লাফিয়ে নেমে পানিতে তার হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়েই সন্তুষ্ট থাকে; আর যদি সে লাফালাফিতে যথেষ্ট দক্ষ না হয় তবে দেখা যায় সে পানিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে রিকশাকে গালাগালি করছে। সে দৃশ্য যথেষ্ট উত্তেজনাকর। রিকশার আরোহী যদি মহিলা হয় তবে উত্তেজনাটা আরো বেড়ে যায়। সেই উত্তেজনাকর দৃশ্য দেখার জন্য বৃষ্টি হলেই রাস্তার পাশে উত্তেজনা প্রিয় মানুষের ভিড় জমে যায়। আর সাংবাদিকেরা তো সম্ভবত ওত পেতেই থাকে এমন একটা দৃশ্যের জন্য। প্রতি বৃষ্টির পরেই আমি পত্রিকায় উল্টে যাওয়া রিকশার ছবি দেখি। আর সব সময় সে ছবিতে রিকশার আরোহী হিসেবে দু'জন মহিলাকে দেখা যায়।

তবে টাউন সার্ভিস বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা রিকশা চড়ার চাইতেও উত্তেজনাকর। এ এমন এক অভিজ্ঞতা যা কোনো উত্তেজনা প্রিয় মানুষেরই

হেলায় হারানো উচিত নয়। বাসে চড়ার প্রথম পদক্ষেপ থেকেই উত্তেজনার শুরু হয়। যখন আশে পাশে কেউ থাকে না, বাসগুলো তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাসের হেল্পার একপাশে দাঁড়িয়ে এক হাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাওয়ার ভঙ্গিতে উপরে তুলে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে। তার চিৎকারের কোনো অর্থ বোঝা যায় না। মনে হয় তার কাছের কেউ মারা গেছে বলে সে বিলাপ করছে। বাসটা একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইহজন্মে সেটা আর কখনো চলবে বলে মনে হয় না। কিন্তু যখন আপনি বাসটায় ওঠার জন্য যাবেন তখনই বাসটা হঠাৎ চলতে শুরু করবে। বাসে ওঠার জন্য তখন আপনাকে বাসের পিছনে দৌড়াতে হবে। দৌড়াতে দৌড়াতে আপনি দেখতে পাবেন যে বাসের দরজায় বঙ্গদেশের সব মানুষ ঝুলে রয়েছে এবং সেখানে আপনার জন্য কোনো জায়গা নেই। কিন্তু যেহেতু আপনি জানেন যে পৃথিবীটা একটা কঠিন জায়গা এবং এখানে যুদ্ধ করে আপনাকে আপনার জায়গা বের করে নিতে হবে, আপনি হাল না ছেড়ে দৌড়াতে থাকবেন। অনেকটা দৌড়ানোর পর আপনি বাসের একটা হাতল ধরতে পারবেন এবং একটা পা কোনোমতে বাসের পাদানিতে তুলে দিবেন। সেই অবস্থায় কিছুটা ছেঁচড়ে এবং কিছুটা অন্য পায়ে লাফাতে লাফাতে আপনি চলতে থাকবেন। তারপর আপনি আল্লার নাম স্মরণ করে ঝুলে পড়বেন। ভাগ্য ভালো হলে আপনার অন্য পা পাদানিটা খুঁজে পাবে। এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হলেও বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার পা পাদানিতে না গিয়ে আপনার শরীর সহ বাসের চাকার নীচেও চলে যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু আপনি বঙ্গদেশে জন্মেছেন, এইসব ছোটখাটো অর্থহীন যুদ্ধ আপনাকে করতেই হবে আর যুদ্ধের ময়দানে এতটুকু ঝুঁকি না নিলেই নয়। বেশিরভাগ সময়ে সহ যোদ্ধারাও বেশ সহৃদয়তা পূর্ণ। এরকম সময়ে কেউ না কেউ আপনাকে টেনে বাসের পাদানিতে উঠতে সাহায্য করবে। আপনি তখন দুইটা কাজ করতে পারেন। হাতল ধরে পাদানিতে আপনি ঐভাবে ঝুলে থাকতে পারেন। এতে করে আপনি বাইরের উন্মুক্ত বাতাস খেতে খেতে যাবার সুবিধাটা পাবেন। অথবা আপনি দরজার ঝুলন্ত মানুষগুলোকে ঠেলে সরিয়ে বাসের ভিতরে আপনার জায়গা করে নিতে পারেন। এটা করতে গিয়ে প্রথমেই আপনি একজনের পা মাড়িয়ে দিবেন আর সে খেঁকিয়ে বলবে- "দেখে পা ফেলতে পারেন না? চোখ কি বাড়িতে রেখে এসেছেন নাকি?" আপনি তার খেঁকানিতে কান না দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে সামনে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় যাবেন আপনি বুঝতে পারবেন না কারণ বাসের সব জায়গায় সমান ভিড়। অবশেষে মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকজনের চাপে পিষ্ট হতে হতে আপনি

শুনতে পাবেন যে ভাড়া নিয়ে একজন যাত্রীর সাথে কন্ডাকটরের একটা গণ্ডগোল দানা পাকিয়ে উঠছে। কন্ডাকটর বলবে সে ন্যায্য ভাড়া চাচ্ছে আর যাত্রী বলবে সে বেশি ভাড়া দাবি করছে, মাত্র গতকালকেও সে এই রাস্তায় গিয়েছে এর অর্ধেক ভাড়া দিয়ে। এক পর্যায়ে যাত্রী আর কন্ডাকটর উত্তেজিত হয়ে পরস্পরকে গালাগালি শুরু করবে। গালাগালিটা হাতাহাতির পর্যায়ে যাওয়ার আগেই অন্য যাত্রীরা উঠে দু'জনকে থামিয়ে দিবে। কন্ডাকটর তখন নিজের মনে গজগজ করতে থাকবে আর যাত্রীরা সব সমস্বরে দেশ, দেশের মানুষ, সরকার ইত্যাদি নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকবে। আর এই পুরোটা সময় বাসের হেল্পার চরম নির্বিকার ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে গলায় মাইক লাগিয়ে চেঁচাতে থাকবে।

বাসটা কিছুক্ষণ পরপর থামতে থাকবে আর কিছু যাত্রী আপনাকে কনুই দিয়ে ঠেলে আপনার পা মাড়িয়ে বাস থেকে নেমে যাবে। আবার নতুন সংগ্রামী যাত্রীরা উঠে এসে ধাক্কা দিয়ে আপনাকে সরিয়ে আপনার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়বে। আপনি গরমে আর চাপে পিষ্ট হতে হতে দরদর করে ঘামতে থাকবেন। এরকম কিছুক্ষণ চলার পর আপনার মনে হবে যে একদিনের জন্য যথেষ্ট উত্তেজনা আপনি নিয়ে নিয়েছেন, আজ আর নতুন কোনো উত্তেজনা না হলেও আপনার চলবে। আপনি তখন বাস থেকে নামার জন্য গুঁতোগুঁতি করে দরজার দিকে এগিয়ে যাবেন এবং হেল্পারকে বলবেন যে আপনি নামবেন। হেল্পার তখন ধাক্কা দিয়ে আপনাকে বাস থেকে ফেলে দিবে।

সত্যি, টাউন সার্ভিস বাসে চড়লে এক মুহূর্ত বিরস লাগে না!

যাক, আমি বরং বর্তমানে ফিরে আসি। আমি আর আমার বন্ধু মুন্না মতিঝিল যাওয়ার জন্য মালিবাগ মোড়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে যাবো সেটা ভাবছিলাম। প্রথমে আমরা ঠিক করলাম আমরা বাসে যাবো। ৬ নম্বর বাস মালিবাগ মোড়ের উপর দিয়ে মতিঝিল যায়, কিন্তু সেটা গুলিস্থান দিয়ে অনেকখানি ঘুরে যায়। এরচেয়ে বরং গাজীপুর পরিবহন ভালো, সেটা রাজারবাগ হয়ে সোজা মতিঝিল চলে যায়। তবে গাজীপুর পরিবহনে ভিড়টা একটু বেশি থাকে। কিন্তু তাতে কি? আমরা না হয় দরজায় ঝুলন্ত দু'-চারজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবো!

কিন্তু পরপর তিনটা গাজীপুর পরিবহন আমাদের ছেড়ে দিতে হলো। আহা, আমরা ইচ্ছে করে ছাড়িনি। ব্যাপার হলো বাসগুলোতে যাত্রীর সংখ্যা একটু বেশি ছিলো আর সেগুলোতে এতো মানুষ ঝুলছিলো যে বাস দেখা যাচ্ছিলো না। ঝোলার জন্য যে বাসটা দরকার সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশ্য

ঝোলার জন্য আমাদের যে বাসই লাগবে তার কোনো কথা নেই, আমরা মানুষ ধরেও ঝুলতে পারতাম। কিন্তু আমরা বাসের কাছাকাছি হতে ঝুলন্ত মানুষগুলো এমনভাবে খেঁকানি জুড়ে দিলো যে আমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

তখন আমরা ঠিক করলাম যে নাহ, বাস নয়; আমরা রিকশা করে যাবো। তাতে পয়সা অবশ্য একটু বেশি লাগবে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়। আমরা তো পয়সা ধরতেই যাচ্ছি।

খোঁজাখুঁজি করে একটা রিকশা ধরে আমরা উঠে বসলাম। আমাদের রিকশাঅলা রাজারবাগের রাস্তা ধরে তীর বেগে রিকশা চালিয়ে দিলো। শুরু হলো এক চমৎকার উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের দিকে আমাদের যাত্রা।

দুই

সময়টা বিংশ শতকের নব্বই দশকের মাঝামাঝি। উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল। মাস কয়েক হলো অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। শোনা যাচ্ছে মতিঝিলে নাকি টাকা উড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে কোটি কোটি টাকা। যে ধরতে পারছে সেই বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। মতিঝিলে স্টক এক্সচেঞ্জ নামে কি যেনো একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটা নাকি মেশিন লাগিয়ে টাকা ছুড়ে মারছে। খপ করে সেই টাকা ধরে নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে ছুটছে মানুষ। বাতাসে টাকার গন্ধ। চারদিকে শুধু স্টক এক্সচেঞ্জের টাকা ওড়ানোর গল্প। কান পাতলে, এবং না পাতলেও টাকা ওড়ানোর গল্প কানে এসে গুঁতো মারে। পত্রিকা খুললে স্টক এক্সচেঞ্জের টাকা ওড়ানোর গল্প ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে না।

দিন কয়েক আগে মুন্নার সাথে এই নিয়ে আমার কথা হচ্ছিলো। আমাদের আশেপাশের পরিচিত জনেরা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠীরা প্রায় সবাই মতিঝিলে টাকা ধরার উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছে। তিনটে কারণে আমরা এখনও সে উৎসবে যোগ দিইনি। প্রথম কারণ কি আমরা জানি না। দ্বিতীয় কারণ- নাহ ভেবে দেখলাম সেটাও আমাদের জানা নেই। আর তৃতীয় কারণটা যে কি সেটা আমরা কখনই জানতাম না। আমরা শুধু জানি যে মতিঝিলে কি

যেনো একটা মচ্ছব ঘটে যাচ্ছে আর আমরা সেখানে যোগ দিইনি। ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ হচ্ছিলো না। আমাদের নিজেদের প্রতারিত মনে হচ্ছিলো আর মুন্নার ভাষায়- আমরা পিছিয়ে পড়ছিলাম।

"বুঝলি, আমরা পিছিয়ে পড়ছি। আমরা সব সময় পিছিয়ে পড়ি। ব্যাপারটা কি ভালো?"

"উঁহু ভালো না। পিছিয়ে পড়া কোনো কাজের কথা না।" আমাকে মুন্নার কথার সারবত্তা মেনে নিতে হলো।

"সবাই গিয়ে মতিঝিলে হামলে পড়েছে। না জানি কি হচ্ছে সেখানে! খবরের কাগজে স্টক এক্সচেঞ্জের কথা ছাড়া অন্য কিছু তোর চোখে পড়ে আজকাল?"

আমাকে স্বীকার করে নিতে হলো যে পড়ে না। এমনিতে খবরের কাগজ দেখার সুযোগ আমি খুব একটা পাই না। কাগজ খুললেই দেখি দু'জন মহিলা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মুখ ব্যাদান করে ভেংচি কাটছে। যতবার আমি তাকাই ততবার এরা ভেংচি কাটে। অনেকে এদের ভেংচি দেখতে ভালোবাসে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার অস্বাভাবিক লাগে। বারবার এদের ভেংচি কাটা দেখে মনে হয় এরা নিশ্চয় অসুস্থ। আমার ধারনা এদের গভীর কোনো অসুখ আছে আর সেই অসুখটাই বারবার এদের দিয়ে ভেংচি কাটিয়ে নেয়। বিচিত্র অসুখ সন্দেহ নেই। মানুষ এদের অসুস্থতার খবর জানে না বলেই এদের ভেংচি দেখতে ভালোবাসে। কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। আমি আবার একটু বেশি সংবেদনশীল বলে অন্যের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি না। দুই মহিলা আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অসুস্থতার কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। আমার সংবেদনশীল মন হাহাকারে ভরে যায়। আমি নিষ্ঠুর হতে পারি না। ওদের অসুস্থতা যেনো আমাকে চোখে দেখতে না হয় সে জন্য আমি খবরের কাগজ এড়িয়ে চলি। তবে ইদানীং ব্যাপারটা অন্যরকম হচ্ছে। হঠাৎ করে স্টক এক্সচেঞ্জ দাপট দেখাতে শুরু করেছে আর সেটার দাপটে সাঙ্গপাঙ্গ সহ মহিলা দু'জন কেমন যেনো ঝিমিয়ে পড়েছে। যুত করে তারা ভেংচি কাটার সুযোগ পাচ্ছে না। কাগজ জুড়ে শুধু স্টক এক্সচেঞ্জের টাকা উড়ানোর গল্প।

মুন্না বললো যে টাকা ওড়ানোটা তার কাছে একটা চমৎকার ব্যাপার বলে মনে হয়। টাকা উড়াতে সে ভালোবাসে। প্রায়ই সে টাকা উড়ায়। যখন তার ঘরে কেউ থাকে না তখন ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে মনের আনন্দে সে টাকা উড়ায়। পরক্ষণেই অবশ্য আবার খপ করে ধরে ফেলে। তারপর আবার উড়ায়। আবার ধরে, আবার উড়ায়। এভাবেই চলতে থাকে যতক্ষণ না তার মনে হয় যে

একদিনের জন্য যথেষ্ট টাকা সে উড়িয়ে ফেলেছে; ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা উচিত। এটা মনে হওয়ার পর সে টাকাগুলোকে ধরে বাক্সবন্দী করে রেখে দেয়।

আমি অবশ্য মুন্নার এভাবে টাকা উড়ানোর মধ্যে কোনো মজা পেলাম না। ঘরের মধ্যে দরজা জানালা বন্ধ করে টাকা উড়ানোতে আমি কোনো আনন্দ খুঁজে পাই না। এভাবে টাকা উড়ানোর মধ্যে কোনো মর্যাদা নেই। হ্যাঁ, টাকা যদি উড়াতেই হয় তবে উড়ানো উচিত খোলা জায়গায়; রাস্তার মাঝখানের আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে। ও কাজের জন্য সেটাই সবচেয়ে সঠিক জায়গা। আমার প্রায়ই ইচ্ছে হয় একদিন আমি রাস্তার আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে টাকা উড়াই। অনেক অনেক টাকা। থেমে থেমে, অনেকক্ষণ ধরে উড়াই। উড়িয়ে উড়িয়ে দেশের সব গরীব-দুখী-দুঃস্থ মানুষদের বড়লোক করে দেই। এই দেশের কিছু মানুষ বড় গরীব। এতো গরীব যে অভাবে এদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়। তখন এরা ত্রাণের টিন চুরি করে বেচতে শুরু করে; রাস্তা-ব্রিজ ইত্যাদি বানানোর টাকা মেরে দিয়ে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে। নর্দমার পানিকে ওষুধ বলে বিক্রি করে দেয়। চালে ডাল মিশায়, ডালে চাল মিশায়। আহা এরা যদি এতো গরিব না হতো, যদি একটু ভালো করে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারতো তাহলে কি আর এদের স্বভাব এমন নষ্ট হতো? আহা আমি যদি এই গরীব-দুখী-দুঃস্থ মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে পারতাম! একটা দিনও যদি আমি আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে এদের জন্য টাকা ওড়াতে পারতাম!

আমি মুন্নাকে বললাম আমার আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে টাকা উড়ানোর ইচ্ছের কথা। শুনে সে বললো সেটা দারুণ একটা ব্যাপার হবে বলে তার মনে হয়। সবচেয়ে ভালো হবে প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে যাবার সময় টাকাটা উড়ালে।

মুন্নার আইডিয়াটা আমার কাছে চমৎকার বলে মনে হলো। আমি বাহবা জানিয়ে ওর আইডিয়ার প্রশংসা করলাম।

আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর রাস্তা দিয়ে যাবার দৃশ্য না দেখে থাকেন আপনি জানেন না আপনি কি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যখন রাস্তা দিয়ে যান তখন রাস্তায় দারুণ একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়ে অন্য রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর মোড়ে মোড়ে পুলিশ বন্দুক বাগিয়ে বসে থাকে একটু বেচাল দেখলেই বন্দুকের বাট দিয়ে গুঁতো মারার জন্য। পুলিশের মেজাজ তখন একটু উত্তেজিত অবস্থায় থাকে আর তারা ভান করতে থাকে যেনো রাস্তার মানুষগুলো সব মূর্তি। একটু নড়াচড়া করলেই মূর্তি-মানুষগুলোর দিকে তারা তেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে

মানুষগুলো মূর্তি সেজে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রী তার বিশাল লটবহর নিয়ে লটরপটর করতে করতে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী যাবার সময় রাস্তার অবস্থা নিয়ে মুন্না একটা গল্প বললো। একবার ওর খালাতো ভাই সাইকেলে করে যাচ্ছিলো। সাইকেলের সুবিধা হলো, রাস্তায় জ্যাম থাকলেও ফাঁক ফোঁকর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। কাওরানবাজার সোনারগাঁ হোটেলের সামনের মোড়ের জ্যামটা সে এই কায়দায় কাটিয়ে সামনে চলে গেলো। সামনে চার রাস্তার মোড়ে গিয়ে দেখলো রাস্তা পুরো ফাঁকা। বেচারা কি কারণে যেনো অন্যমনস্ক ছিলো, লক্ষ্য করেনি যে সব মোড়ের গাড়ি ঘোড়াই বন্ধ হয়ে আছে আর পুলিশগুলো বন্দুক বাগিয়ে বসে আছে। ফাঁকা রাস্তা দেখে সে মনের আনন্দে সাইকেল চালিয়ে দিলো। আর তারপরই হঠাৎ সে সাইকেল সহ শূন্যে উঠে গেলো। ব্যাপারটা কি হলো সে ভালো করে বুঝলো না। তার ধারনা হলো যে মহা প্রলয় শুরু হয়ে গেছে আর পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠলো আর তারপরই নিজেকে সে ফুটপাতে আছড়ে পড়তে দেখলো। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো যে মহা প্রলয় শুরু হয়নি, দু'জন পুলিশ ছুটে এসে সাইকেল সহ তাকে শূন্যে তুলে ফুটপাতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ব্যাপারটা তার কাছে অপমানজনক মনে হয়েছিলো আর তার ধারণা এতে তার মর্যাদার হানি হয়েছিলো। এরপর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাস্তায় বেরোলেই সে বাসায় গিয়ে লুকিয়ে থাকতো।

এমন একটা ব্যাপার একবার আমি নিজেও দেখেছিলাম। সেদিন আমি বাসে করে কোথায় যেনো যাচ্ছিলাম। ফার্মগেটের কাছাকাছি এসে বাসটা প্রধানমন্ত্রী জ্যামে আটকে গেলো। আমার মনে হলো এখানে প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় বসে থেকে সময় নষ্ট করার চেয়ে হেঁটে গেলেই ভালো হবে। বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় চলে এলাম। হঠাৎ পুলিশের তীব্র হুইসেলের শব্দে সামনে তাকিয়ে দেখি ফাঁকা রাস্তায় একটা সাইকেল তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে আর তার পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে তিনজন পুলিশ। সাইকেল চালক মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে আর পুলিশ দেখে সাইকেলের গতি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। আশেপাশের মানুষেরা সবাই সাইকেল চালকের পক্ষে চলে গেলো। বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তারা চিৎকার করে আর হাততালি দিয়ে সাইকেল চালককে উৎসাহ দিতে লাগলো। সাইকেল চালক সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাইকেলটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললো। দুঃখের বিষয় চালকটা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ আরেক পুলিশ সামনে থেকে লাফিয়ে পড়লো সাইকেলের সামনে। চালক তাল সামলাতে না পেরে

হুড়মুড় করে গিয়ে আছড়ে পড়লো পুলিশের ঘাড়ে।

আমি আর মুন্না বসে বসে এই সব ঘটনা আলোচনা করলাম। আমরা একমত হলাম যে প্রধানমন্ত্রীর রাস্তায় টাকা উড়ানো একটা দারুণ উত্তেজনাকর ব্যাপার হবে। অতএব আমরা ঠিক করলাম যে আমরা মতিঝিলে যাবো। মতিঝিলে ওড়ানো টাকা ধরে বস্তা বন্দি করে আমরা কোনো একদিন প্রধানমন্ত্রীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে উড়াবো।

আমাদের রিকশা মতিঝিলে পৌঁছতে আমরা দেখতে পেলাম কি কাণ্ড ঘটছে সেখানে। স্টক এক্সচেঞ্জের সামনের রাস্তা জুড়ে হাজার হাজার মানুষ। রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা গিজ গিজ করছে মানুষ। তবে কিনা মানুষ দেখে আমরা অবাক হই না। এতো মানুষেরই দেশ। এ দেশে যেখানেই যাওয়া হোক অসীম সংখ্যক মানুষ দেখা যায়। আর পত্রিকার ভাষায়- দেশের সব প্রান্ত থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই ছুটছে ঢাকার মতিঝিলে টাকা ধরার নেশায়।

আমরা অবশ্য রাস্তায় শুধু মানুষ দেখলাম, কিন্তু কোনো টাকা উড়তে দেখলাম না। আমি আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলাম, "কোথায় টাকা? আমি তো কিছু দেখছি না! তুই দেখতে পাচ্ছিস?"

"উঁহু।"

"তাহলে যে সবাই বলছে মতিঝিলে টাকা উড়াচ্ছে?"

"আমার মনে হয় সব সময় উড়ায় না, হঠাৎ হঠাৎ উড়ায়।" মুন্না বললো। "দেখছিস না মানুষগুলো কেমন ঘোরাঘুরি করছে। আসলে তক্কে তক্কে রয়েছে, যেই টাকা উড়বে অমনি খপ করে ধরবে!"

আমাদের রিকশাঅলা বললো, "এখানে থাকলেই দেখবেন কেমনে ট্যাকা ওড়ে।"

"তাই নাকি? তুমি ধরেছ নাকি কিছু?"

"না, ক্যামনে ধরুম? ট্যাকা ধরতে গেলে ট্যাকা থাকা লাগে।"

তার কথাটা বাস্তব কথা বলে আমাদের মনে হলো। আমরা তাকে বাহবা দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়লাম। মুন্না সামনে দেখিয়ে বললো, "দ্যাখ, ঐ হচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জ। ঐখান থেকেই টাকা উড়ায়।"

আমি দেখলাম। ছয়তলা একটা বিল্ডিং। সামনে বড় বড় করে লেখা রয়েছে- 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ'। এই বিল্ডিংটাই পাগল করে দিয়েছে মানুষকে। এই বিল্ডিং থেকে উড়ানো টাকা ধরার জন্য ছুটছে লাখো লাখো মানুষ। সংখ্যাটা কোটি কোটিও হতে পারে, কে জানে।

রাস্তা পার হয়ে আমরা মানুষের ভিড়ে মিশে গেলাম। কিভাবে স্টক এক্সচেঞ্জ টাকা উড়ায় আর সে টাকা কিভাবে ধরা যায় সে বিষয়ে আমাদের বেশি কিছু জানা নেই। আমরা হচ্ছি রবাহূত। রব শুনে কিছু না জেনেই আহত হয়েছি। আহত? না, আহত বোধহয় আমরা হইনি। হয়েছি আহূত। রব শুনে আমরা চলে এসেছি আর এখন মানুষের সমুদ্রে পড়ে খাবি খাচ্ছি। খাবি খেতে খেতে আমরা হাঁটছিলাম আর পরিচিত কাউকে খুঁজছিলাম। পরিচিত কাউকে পেলে তার কাছে টাকা ধরার পদ্ধতিটা জেনে নেয়া যাবে। কিন্তু পরিচিত কাউকে চোখে পড়ছিলো না। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এমন সময় স্টক এক্সচেঞ্জের পাশের ফুটপাতে আমাদের কয়েকজন সহপাঠী বন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। মোস্তাক, কায়সার আর মামুন। মোস্তাক ছোটখাটো গাটুস গুটুস দেখতে আর একটু খ্যাপাটে স্বভাবের। খ্যাপাটে স্বভাবের কারণে আমরা তাকে পাগলা মোষ বলে ডাকি। সে আমাদের দেখে বললো, "তোরা এসেছিস? তাহলে আমাদের এবার যাবার সময় হলো।"

"তার মানে কি?" আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

"তোরা দু'জন যেখানে যাবি, যাবি একেবারে সবার শেষে। যখন কোনো কিছু তুঙ্গে উঠে যাবে তখন তোরা সেখানে গিয়ে হাজির হবি। তোরা যাওয়ার পরই সেটা শেষ হয়ে যাবে আর তোরা কেনো এতো তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেলো তাই নিয়ে আফসোস করবি। এই যে শেয়ার বাজার জমে উঠেছে কতদিন হলো আর তোরা এখন এলি। এর মানে হচ্ছে শেয়ার বাজার চরমে উঠে গেছে, এইবার নেমে যাবে।"

এ কথায় আমাদের অপমানিত বোধ করা উচিত কিনা সেটা নিয়ে আমি আর মুন্না আলোচনা করলাম। মুন্না হচ্ছে যাকে বলে উত্তেজিত স্বভাবের ছেলে। সে অল্পেই উত্তেজিত হয় আর উত্তেজিত হয়ে বিচিত্র কর্মকাণ্ড করতে শুরু করে। সে বললো মোস্তাক যদি আমাদের অপমান করে থাকে তবে তাকে সে তুলে ছুড়ে ফেলে দিবে।

কায়সার আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "আরে মোস্তাকের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছিস কেনো? শেয়ার বাজার বসে যাবে না। সেটা আছে, থাকবে।"

মুন্না তখন শান্ত হয়ে চুপ করে গেলো। আমরা ওদের পাশে দাঁড়িয়ে শেয়ার বাজার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে লাগলাম। চারদিকে মানুষের ভিড়। মানুষগুলো যে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তা না। তারা হাঁটা হাঁটি করছে। সবার কাছে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার। শেয়ারগুলো হাতে ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা সেগুলো বিক্রি করার জন্য চেঁচাচ্ছে- ট্যানারি সেল... জিল বাংলা সেল...

এসিআই সেল... ফার্মা সেল... শাইনপুকুর সেল... ইত্যাদি। যার কাছে যে কোম্পানির শেয়ার সে সেই কোম্পানির নাম ধরে সেল সেল বলে চিৎকার করছে। দামা দামি হচ্ছে, বেচা বিক্রি হচ্ছে।

শেয়ারের বেচা কেনা এভাবে রাস্তার উপরে হওয়ার কথা না। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে হঠাৎ করে সব কোম্পানির শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক বাড়তে শুরু করেছে। প্রায় প্রতিদিন দাম বাড়ে। অবস্থা এমন হয়েছে যে সকালে শেয়ার কিনে বিকেলে বিক্রি করে দিলেই লাভ হচ্ছে। অল্প সময়ে প্রচুর লাভ হওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মানুষ। অসংখ্য মানুষ চলে আসায় বাইরে রাস্তার উপর মার্কেট গড়ে উঠেছে। এটাকে বলে কার্ব মার্কেট। কার্ব মার্কেটের মানুষেরা নিজেরা নিজেরা শেয়ার বেচা কেনা করে। কেউ এপাশ থেকে কিনে ওপাশে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। কেউ স্টক এক্সচেঞ্জের ভিতর থেকে কিনে বাইরে এসে বিক্রি করে, আবার কেউ বাইরে কিনে ভিতরে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। মোট কথা বেচা কেনার একটা মহোৎসব চলছে।

মামুনের কাছে কি একটা কোম্পানির শেয়ার আছে। বিক্রি করার জন্য অনেকক্ষণ ধরে সেটা মাথার উপর ধরে সেল সেল বলে চেঁচাচ্ছে সে। একজন ক্রেতা এসে দাম জিজ্ঞেস করতে মামুন পঁয়তাল্লিশ টাকা জানিয়ে দিলো। লোকটা আটত্রিশ টাকা দিতে চাইলো। মামুন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জানিয়ে দিলো এক দাম।

এক দাম শুনে লোকটার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। সে একইরকম তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে প্রশ্ন করলো- "উনচল্লিশ দিবেন?"

"আরে না, পারি না।"

"চল্লিশ?"

"বললাম তো এক দাম।"

"আরে রাখেন মিয়া আপনের একদাম। শোনেন, সাফ কথা কই, বেয়াল্লিশ টাকা দিমু। দিলে দেন, না দিলে যাই গিয়া।"

এবার মামুনের মধ্যে বিচলিত ভাব লক্ষ্য করা গেলো। সে তার এক দাম নীতি পরিত্যাগ করে বললো, "আর এক টাকা দেন।"

"বেয়াল্লিশ টাকার বেশি এক কানা কড়িও দিব না।"

"দিলেই বা নিচ্ছে কে? কানাকড়ি কোনো কাজে লাগে না। আচ্ছা যান, আর আট আনা দিয়েন।"

"দূর মিয়া আপনে খালি বেশি প্যাঁচাল পারেন। বেয়াল্লিশ টাকা হলে দেন, না হলে যাই গিয়া।"

তখন দু'জনের মধ্যে তুমুল দামাদামি শুরু হয়ে গেলো। মামুন আট আনা না হলে দিবে না, ক্রেতা কিছুতেই আট আনা দিতে রাজি না। শেষ পর্যন্ত মামুন আট আনা থেকে নেমে গিয়ে চার আনার জন্য ঝগড়া শুরু করে দিলো। দামাদামির বহর দেখে মুন্না নীচু গলায় খি খি করে হেসে বললো, "আরে এ দেখছি ফকিরা ব্যবসা, চার আনার জন্য কেমন ঝগড়া করছে দেখেছিস?"

"ব্যাপারটা ওরকম না।" মোস্তাক বললো, "ধর তোর কাছে এক লক্ষ শেয়ার আছে। চার আনা করে এক লক্ষ শেয়ারে কতো পড়ে?"

"পঁচিশ হাজার।"

"তবেই দেখ। চার আনা কম হলো কিসে?"

"মামুনের কাছে শেয়ার আছে কতগুলো?"

"পঞ্চাশটা।"

মোস্তাকের কথা শুনে আমরা সব সময় না হাসার চেষ্টা করি। কারণ আমরা কখনই পাগলা মোষকে খেপিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু এখন আমরা অনুভব করলাম আমাদের পক্ষে হাসি চেপে রাখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। মুন্নার দিকে চেয়ে দেখি নিঃশব্দে হাসার চেষ্টায় তার মুখ বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে একটা অট্টহাসি বের হয়ে আসার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। আর আমার অবস্থা এমন হলো যে হাসি চেপে রাখার চেষ্টায় আমার পেট ফুলে উঠলো। দুই ঠোঁট জোর করে চেপে ধরে রাখার ফলে গাল ফুলে উঠে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। অবশেষে আর থাকতে না পেরে আমি হাসিটা ছেড়ে দিলাম। মুন্না এতো জোরে হাসতে লাগলো যে এই ভিড়েও লোকজন তাকে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলো। মামুনের ক্রেতা বিরক্ত হয়ে চলে গেলো আর মামুন রাগ দেখিয়ে বললো যে আমাদের হাসির জন্যই তার বিক্রিটা হলো না। আমরা বললাম যে সাড়ে বারো টাকা লস হয়ে যাওয়ায় মামুনের রাগ না দেখিয়ে দুঃখিত হওয়া উচিত এবং দুঃখে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পরা উচিত। এতে মামুন নিজের দুঃখটা যেমন আর টের পাবে না তেমনি দেশের মানুষ একজন কমবে। দেশ অবশ্য একজন বড় ব্যবসায়ীকে হারাবে কিন্তু তাতে আমাদের কি আসে যায়!

দিনটা আমাদের ব্যবসা দেখে চলে গেলো। মোস্তাক আমাদের বললো তার পরিচিত একজন মাস দুই আগে একটা কোম্পানির শেয়ার কিনেছে তিন হাজার টাকা করে, ঐ শেয়ারের মূল্য এখন বারো হাজার টাকা। কিন্তু সে দাম বিশ হাজার না হওয়া পর্যন্ত বেচবে না। মোস্তাকের নিজের কাছেও একটা কোম্পানির শেয়ার আছে যেটা সে একশো বিশ টাকা করে কিনেছে আর এখন যেটার দাম

প্রায় চারশো। সে বসে আছে শেয়ারটার দাম এক হাজার হওয়ার জন্য। এভাবে প্রায় সবাই দু'রকম ব্যবসা করছে। কিছু শেয়ার কিনে রেখে দিয়েছে দাম অনেক বাড়ার আশায় আর কিছু শেয়ার কিনে দু-একদিন পরেই অল্প লাভে বিক্রি করে দিচ্ছে।

বিকেলের দিকে ভিড় আরো বাড়তে লাগলো। বিভিন্ন পেশার মানুষ পেশাগত কাজ কোনোমতে সেরেই দৌড়ে আসছে শেয়ার বাজারে। বেচা আর কেনার ধুম চারদিকে। কি কি শেয়ারের দাম বাড়লো আর কি কি কমলো সেই নিয়ে হৈ চৈ।

সন্ধ্যার দিকে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কোটেশন দেয়া হয়। কোটেশনে স্টক এক্সচেঞ্জে ঐ দিনের বেচা কেনার বিবরণ দেয়া থাকে। কোন শেয়ারের দাম বেড়েছে কোনটার কমেছে, কোন শেয়ার কতো বিক্রি হয়েছে ইত্যাদি। এইসব বিবরণ অবশ্য পরদিন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু যারা এখানে ব্যবসা করছে তারা অতক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারে না। কোটেশন দেয়ার সাথে সাথে খবর পাওয়া চাই।

সন্ধ্যার পর আমরা গেলাম কোটেশন সংগ্রহের জন্য। স্টক এক্সচেঞ্জের উল্টোদিকের একটা পেট্রোল পাম্পের পাশের একটা ঘুপচি ঘর থেকে কোটেশন দেয়। আমরা গিয়ে দেখলাম বিশাল লাইন দাঁড়িয়েছে। আমরা তখন একপাশে জড়ো হয়ে লাইনে দাঁড়াবো কিনা তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

লাইনের দাঁড়ানোর বিষয়টা শুনতে যতটা সহজ বলে মনে হয় সেটা আসলে ততো সহজ নয়। বাংলাদেশের মানুষ যখন লাইনে দাঁড়ায় তখন সেটা একটা দেখার মতো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমদিকে লাইনটা যখন ছোট থাকে তখন সেটাকে লাইন বলেই চেনা যায়; কিন্তু একটু বড় হয়ে যাওয়ার পরেই সেটার আগা-মাথা-গোড়া পেঁচিয়ে তালগোল পাকিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কোনটা লাইন সেটা আর বোঝা যায় না। লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেকটা মানুষের পাশে আরো কয়েকজন জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় যে তারা আলাদা আলাদা লাইনে দাঁড়িয়েছে। লাইনের পিছনের দিকে গোল বৃত্তের সৃষ্টি হয় আর কোনোভাবেই লাইনের গোড়া খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেও আমরা একই অবস্থা দেখতে পেলাম। অনেক দূরে কোটেশন ঘরের সামনে লাইনের একটা মাথা আছে বলে আমাদের মনে হলো, কিন্তু কোনটা গোড়া আমরা বের করতে পারলাম না। কায়সার বললো কেউ যদি লাইনের গোড়া খুঁজে দিতে পারে তবে সে লাইনে দাঁড়াতে রাজি আছে।

"গোড়া খুঁজে পাওয়া এমন কি কঠিন?" মোস্তাক বললো। "কঠিন ভাবিস

নাকি? কঠিন ভাবলেই কঠিন, আসলে খুব সহজ। মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেই লোকজন ধাক্কা মেরে গোড়ায় পাঠিয়ে দিবে।"

ওর বুদ্ধিটা আমাদের চমকপ্রদ মনে হলো। আমরা ওকে বললাম বুদ্ধিটা প্রয়োগ করে দেখাতে।

"পারবো না নাকি? কি ভাবিস আমাকে? দাঁড়া এক্ষুনি তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মোস্তাক এগিয়ে গিয়ে কোটেশন ঘরের একদম সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। অমনি পিছন থেকে একদল চেঁচিয়ে উঠলো, "ঐ মিয়া আমরা দু' ঘণ্টা ধরে দাঁড়ায় আছি আর আপনি দৌড়ে এসে সামনে চলে গেলেন মানে কি? আমার কি এখানে ইয়ার্কি মারতেছি নাকি? যান পিছনে যান।"

বলতে বলতে কয়েকজন তাকে হিড় হিড় করে টেনে পিছনে পাঠিয়ে দিলো। সেখান থেকে অন্যরা ঠেলে তাকে আরেকটু পিছনে পাঠালো। এরপর অবশ্য তালগোল পাকিয়ে গেলো কারণ কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর আসল লাইন কোনটা তা কেউ বলতে পারলো না। বাধ্য হয়ে মোস্তাক ফিরে এলো আর আমরা সবাই লাইনের পিছনে জড়ো হয়ে লাইনের বৃত্তটাকে আরেকটু বড় করলাম।

লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে মুন্না আমাদের একটা চমৎকার গল্প বললো। সেবারে সে আর তার খালাতো ভাই কি একটা কাজে ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলো। গিয়ে দেখে ঐদিন সেখানে কি একটা গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে ওরা কিছু জানতো না। ওরা যে কাজে গিয়েছিলো সেটা দ্রুত শেষ হয়ে যেতে ওরা ভাবলো যে এসেছে যখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা দেখা যাক। কিন্তু টিকেট কাটতে গিয়ে দেখলো কাউন্টারে টিকেট নেই। কালো বাজারে একশো টাকার টিকেট পাঁচ-ছয়শো টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একশো টাকার টিকেট এতো দাম দিয়ে কেনা ওদের কাছে অন্যায় বলে মনে হলো। কম দামে টিকেট কেনার জন্য ওরা ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে ওরা দেখল যে স্টেডিয়ামের সবগুলো গেটে বিশাল বিশাল লাইন দাঁড়িয়েছে। একেকটা লাইন সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোথায় চলে গেছে তার কোনো ঠিক নেই আর মানুষগুলো সব রঙিন কাপড় চোপড় পড়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে উল্লাস করছে। দেখতে দেখতে ওদের মনে হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না দেখলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না; জীবনটাকে অর্থবহ করতে হলে অনুষ্ঠানটা দেখতেই হবে। কিন্তু ততক্ষণে কালো বাজারের টিকেটও শেষ হয়ে এসেছে আর যা দুই একটা আছে তার দাম হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ঐ দামে টিকেট কেনার মতো

টাকা ওদের কাছে ছিলো না। ওরা ভাবল যে এরকম অর্থহীন জীবন রাখার কোনো দরকার নেই; এক্ষুণি ওরা দড়ি কিনে বাসায় গিয়ে ঝুলে পড়বে। হঠাৎ একটা গেটে ছোট একটা লাইন ওদের চোখে পড়লো যেটাতে মাত্র পঞ্চাশ ষাট জন দাঁড়িয়ে আছে। খালাতো ভাই লাইনটা দেখে বললো, "দাঁড়াবি?"

"চল।" কোনো কিছু না ভেবেই মুন্না রাজি হয়ে গেলো।

ওরা তখন লাইনটার শেষে গিয়ে দাঁড়ালো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওদের পিছনে কয়েকশো মানুষ দাঁড়িয়ে গেলো আর সেখান থেকে সমুদ্র গর্জনের মতো আওয়াজ উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর স্টেডিয়ামের গেট খুলে দিতে লাইনটা সামনে এগোতে শুরু করলো। সামনে এগোতে এগোতে ওরা তখন গেটের লোহার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে মাঠ দেখতে পাচ্ছে; আর কয়েক পা এগোলেই পুলিশ ওদের ধরবে আর টিকেট নেই দেখে ছুড়ে ফেলে দিবে। ওরা ভাবতে শুরু করেছে এইবেলা সম্মানটা হাতের মুঠোয় করে ওরা ভেগে যাবে, এমন সময় পিছনের সমুদ্রে ঢেউ উঠলো আর সেই ঢেউয়ে আছড়ে পড়লো দু'জন। ধাক্কাধাক্কির চোটে কে কোথায় ছিটকে গেলো ওরা বলতে পারে না, কিন্তু চোখ খুলেই ওরা দেখলো যে ওরা গ্যালারীতে পৌঁছে গেছে আর সামনে বিশাল সবুজ মাঠ।

মুন্নার মতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা ছিলো চমৎকার আর এমন অদ্ভুত ভাবে বিনা পয়সায় দেখার ফলে সেটা ছিলো তার দেখা শ্রেষ্ঠ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। তবে আসল কাণ্ডটা হয়েছিলো এর পরের বার, যখন ওরা সমাপনী অনুষ্ঠানটাও দেখতে গেলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাফল্যের পর সমাপনী অনুষ্ঠানের খোঁজ ওরা আগে থেকেই রেখেছিলো। ওদিকে ক্রীড়া পরিষদও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখে সমাপনী অনুষ্ঠানের টিকেটের দাম দুশো টাকা করেছে। ওরা দু'জন সমাপনী অনুষ্ঠানের অনেক আগেই টিকেট কিনে ফেললো। প্রত্যেকেই দুটো করে টিকেট কিনলো এই আশায় যে একটা টিকেট দিয়ে ওরা ঢুকবে আর একটা চড়া দামে বিক্রি করে নিজেদের টিকেটের টাকা উশুল করে নিবে। নির্ধারিত দিনে ওরা স্টেডিয়ামে গিয়ে দেখে ঐদিন বাজারে এতো টিকেট যে কেনার মানুষ নেই। কালো বাজারিরা দুশো টাকার টিকেট ত্রিশ চল্লিশ টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। ওরা ওদের বাড়তি টিকেট বিক্রি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো কিন্তু কেউ ওদের টিকেটের মূল্য দশ বারো টাকার বেশি দিতে রাজি হলো না। অনেক চেষ্টার পর ওরা একটা বলির পাঠা খুঁজে পেলো যে পঁচিশ টাকা দিতে রাজি। ওরা পঁচিশ টাকাতেই টিকেট বিক্রি করে দিলো কিন্তু সেই লোক তখন ওদের সাথে ঝুলে পড়লো এই বলে যে তাকে সাথে করে

স্টেডিয়ামে ঢুকতে হবে যাতে করে টিকেট নকল হলে সে যেনো তার টিকেটের টাকা ফেরত নিতে পারে। মুন্না বললো যে সেই মুহূর্তে দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো আর ইচ্ছে করছিলো ঐ লোকটাকে ছুড়ে স্টেডিয়ামের ভিতর ফেলে দিতে। এর পর থেকে লাইন দেখলেই তার মধ্যে কু প্রবৃত্তি জেগে ওঠে আর লাঠি হাতে লাইনটাকে তাড়া করতে ইচ্ছে করে।

আমরা লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে মুন্নার গল্প শুনছিলাম। মুন্না বেশ জমিয়ে গল্প বলতে পারে ফলে ওর গল্প শুনে আমাদের হাসতে হাসতে দম শেষ হয়ে এলো। আমরা বললাম যে আমরা আর হাসতে রাজি না কারণ ভবিষ্যতে হাসার জন্য কিছু দম আমাদের জমা করে রাখা উচিত। এদিকে রাত পায় আটটা বাজতে চললো অথচ এখনও কোটেশন দিচ্ছে না দেখে অপেক্ষমাণ জনতা ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। বিকেল থেকে জনতা দুটো জিনিসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। সন্ধ্যা আর কোটেশন। শুধুমাত্র সন্ধ্যাটা সময়মত এসেছে।

জনতার মধ্যে ক্রমশ গুঞ্জন বাড়তে লাগলো। অন্যদিন ছয়টার মধ্যে কোটেশন দিয়ে দেয় আজ কেনো এখনও দিচ্ছে না? কেনো এতো দেরি হচ্ছে? ধীরে ধীরে জনতার ক্ষোভ বাড়তে লাগলো। মুখে মুখে সবকিছুর মুণ্ডুপাত শুরু করলো তারা। দেখা গেলো সবকিছুর বিরুদ্ধেই তাদের ক্ষোভ। সবকিছুর প্রতিই তারা অসন্তুষ্ট। অক্টোবর মাসেও এই বিচ্ছিরি গরম আবহাওয়া, ঢাকা শহরের রাস্তার জঘন্য ধোঁয়া আর ধুলো, ভাঙাচোরা গাড়িঘোড়ার বিচিত্র শব্দ, স্টক এক্সচেঞ্জের সব অকম্যা ধেড়ে কর্মচারী সবকিছুর বিরুদ্ধেই অভিযোগ করতে লাগলো তারা। সবকিছুকে নরকে পাঠাতে শুরু করে দিলো। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে উঠলো, "ঐ, আজকে কোটেশন দিবনি হালায়?"

এই চিৎকারটা ছিলো সূচনা। এতক্ষণ যেনো গভীর আগ্রহে এটারই প্রতীক্ষায় ছিলো জনতা। এই চিৎকারটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শুরু হয়ে গেলো জনতার সম্মিলিত চিৎকার-

"ঐ হালারা, ভালোয় ভালোয় কোটেশন দিবি না ঘর ভাঙুম?"

"ঐ ডিম পারসনি বইসা বইসা? ডিম পারস? ঐ দেখা তো কতো বড় ডিম?"

"আরে কি কাণ্ড! কোটেশন দিতে এতো দেরি হয়?"

"লাইনে দাঁড়ায়ে হালুয়া বের হয়ে গেলো, শালারা নাটক দেখে বইসা বইসা। ঐ এটা কি লীলা খেলা পাইছস?"

এরকম বিকট সব চিৎকারের মধ্যে হঠাৎ আরেকটা চিৎকার উঠলো, "পাইছি পাইছি..."

মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো জনতা। লাইন টাইন ফেলে হুড়মুড় করে ছুটে গেলো কোটেশন ঘরের দিকে। কোটেশন পাওয়ার পর দেখা গেলো সব শেয়ারের দাম বেড়েছে। জনতার মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে স্টক এক্সচেঞ্জের মুণ্ডুপাত করছিলো তারা এখন সেটার জয়ধ্বনি শুরু করে দিলো। মোস্তাক কায়সার আর মামুনের মুখ দেখলাম এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হয়ে গেছে। ওদেরকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর আমরা বুঝতে পারলাম ওরা আসলে হাসছে।

বাড়ির পথে ফিরতে ফিরতে আমরা দেখলাম এই রাত্রেও বহু মানুষ মতিঝিলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। স্টক এক্সচেঞ্জে বিকেলের মধ্যেই বেচা কেনা শেষ হয়ে গেলেও কার্ব মার্কেটে বেচা কেনা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। মাঝখানে অল্প কিছুক্ষণের বিরতির পর আবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ছুটে যায় মানুষ। অনেকে নাকি সেখানেই কাঁথা বালিশ নিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। শেয়ার ব্যবসাটা মানুষ করছে একেবারে জান লড়িয়ে।

তিন

বাতাসে পোলাউয়ের গন্ধ। মেসের গেটে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে পোলাউয়ের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারলো। আমি একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। পোলাউ কি আমাদের মেসেই হচ্ছে না অন্য কোনো বাসা থেকে গন্ধ উড়ে আসছে? এরকম ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটে। অন্য কোথাও থেকে পোলাউয়ের গন্ধ উড়ে এসে ধাক্কা মারে। আমাদের মেসে পোলাউ হয়েছে ভেবে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। তারপর মেসে ঢুকে দেখি সেদিন আমাদের বুয়া আসেনি বলে মেসে রান্না হয়নি; জামাল ভাই ভাত রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছেন আর সেই পোড়া ভাত সবাই দলা পাকিয়ে খাচ্ছে। আমি তখন শার্লক হোমস হয়ে যাই। গন্ধ শুকে শুকে পোলাউঅলা বাড়িতে গিয়ে বলি যে হয় আমাকে পোলাউ খাওয়াতে হবে নয়তো অন্যের বাসার আশেপাশে তাদের পোলাউয়ের গন্ধের এভাবে ঘুর ঘুর করা বন্ধ

করতে হবে। মায়ার সাথে এভাবেই আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো। মায়া, পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার সেই মেয়েটি যার কথা মনে পড়লে আমি উদাস হয়ে যাই। কিন্তু মায়ার কথা এখন থাক। তার কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

নাকটা মেসের ভিতরে গলিয়ে মনে হলো পোলাউটা আমাদের মেসেই হচ্ছে। গন্ধে ভুড়ভুড় করছে চারদিক। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখি জমকালো প্রদর্শনী চলছে সেখানে। জামাল ভাই বিশাল হাড়িতে পোলাউ রান্না করছেন, তার চারদিকে গোল হয়ে তার রন্ধন শিল্প দেখছে কয়েকজন।

জামাল ভাইয়ের রন্ধন প্রক্রিয়াটাকে আমি শিল্পই বলবো। তার রান্না দেখতে আমার ভালো লাগে। তিনি যখন রান্না করেন তখন আশেপাশের বাসার সবাই জেনে যায় যে জামাল ভাই রান্না করছেন। লোকজন তখন বাসা থেকে বের হয়ে এসে ভিড় করে তার রান্না দেখতে লেগে যায়। রান্না শুরু করার প্রথমেই তিনি গ্যাসের চুলাটা পুরো গ্যাস দিয়ে জ্বালিয়ে নিবেন। চুলাটা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে এই অবস্থায় তিনি একটা খালি হাঁড়ি চুলার উপর বসিয়ে দেখতে যাবেন হাঁড়িটা ঠিকমতো বসে কিনা। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের আঁচ এসে তার হাতের লোম পুড়িয়ে দিবে আর তিনি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে হাঁড়িটা ফেলে দিবেন। হাঁড়িটা গিয়ে পড়বে অন্য একজনের ঘাড়ে। সে গরম হাড়ি ঘাড়ে পড়েছে ভেবে চিৎকার করে লাফাতে থাকবে। জামাল ভাই বিরক্ত হয়ে বলবেন যে হাঁড়িটা গরম না কাজেই এমন চিল্লানোর কিছু হয়নি। সে তখন লাফালাফি বন্ধ করবে কিন্তু ইতিমধ্যেই তার লাফালাফির চোটে হাঁড়িটা কয়েক জায়গায় গুঁতো খেয়ে একদিকে ট্যামা হয়ে যাবে। এমন একটা ট্যামা হাড়িতে রান্না করাটা জামাল ভাইয়ের অলক্ষুণে মনে হবে এবং তিনি একটা নতুন হাড়ি দাবি করবেন। নতুন একটা হাড়ি খুঁজে বের করা হবে কিন্তু দেখা যাবে যে সে হাঁড়িটা এতো ছোট যে সেটাতে সবার জন্য রান্না করতে গেলে তিনবার করতে হবে। তখন তিনি ট্যামা হাঁড়িটাকেই পাকড়ে ধরে সেটার মধ্যে চাল ঢুকিয়ে রান্নাঘরের হাউসের মধ্যে চালটা ধুতে যাবেন। চাল ধুতে গিয়ে দেখা যাবে যে অর্ধেক চাল পানির সাথে পড়ে গেছে। তখন পড়ে যাওয়া চাল আবার তোলা হবে না নতুন করে আবার চাল দেয়া হবে সে বিষয়ে তিনি অন্যদের মতামত জানতে চাইবেন। দলটা দু'ভাগ হয়ে যাবে। একভাগ বলবে যে খাওয়ার জিনিস এভাবে নষ্ট করা পাপ আর জেনেশুনে এমন একটা পাপ কাজ তারা হতে দিতে পারে না; কাজেই চালটা তুলে আবার হাঁড়িতে দেয়া হোক। আরেক দল বলবে যে রান্নাঘরের হাউসের মধ্যে পড়ে যাওয়া চাল তুলে খাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না; এর চাইতে তারা বরং না খেয়ে থাকবে।

জামাল ভাই তখন পড়ে যাওয়া চালটুকু তুলে আলাদা করে রেখে দিবেন আর বলবেন যে ওটা শুকানোর পর চালের ড্রামের মধ্যে ঢেলে দিলেই আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এরপর তিনি নতুন করে চাল নিয়ে হাঁড়িটাকে চুলার উপরে বসিয়ে দিবেন। বসানোর পর তার মনে হবে যে হাঁড়িতে পানি বেশি হয়েছে। এরপর তিনি হাঁড়িটাকে চুলা থেকে তুলে পানি কমাতে যাবেন আর সেটা করতে গিয়ে হাঁড়িটা তার হাত থেকে পড়ে যাবে। চাল আর পানি ছিটকে উঠে সবাইকে মাখিয়ে দিবে আর জামাল ভাই বিরক্ত মুখে হাঁড়িটার দিকে চেয়ে থাকবেন। তাকে দেখে মনে হবে যে হাঁড়িটার এরকম বেয়াড়াপনায় তিনি মহা বিরক্ত। অবশেষে তিনি হাঁড়িটা তুলে আবার চুলায় বসিয়ে দিবেন। এরপর তিনি আনন্দের হাসি হাসবেন আর সবাইকে নিয়ে ঘরে গিয়ে তাস খেলতে বসে যাবেন। অনেকক্ষণ পরে কারো মনে হবে যে কেমন যেনো পোড়া গন্ধ বের হচ্ছে; মনে হয় কিছু একটা পুড়ছে। অন্যরা মুখ তুলে নাক টেনে তার কথার সমর্থন জানাবে। জামাল ভাই তখন সর্বনাশ হয়েছে বলে রান্নাঘরে দৌড়ে যাবেন এবং দেখবেন যে হাড়ির তলায় কালো কি যেনো একটা পিণ্ড দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। তিনি চেষ্টা করবেন দলাটাকে হাড়ির তলা থেকে ছাড়াতে আর এটা করতে গিয়ে হাড়ির তলাটা তিনি ফুটো করে ফেলবেন। তখন তিনি কাউকে বাইরে খাবার কিনতে পাঠাবেন। ঘণ্টা খানেক পর সে ফিরে এসে জানাবে যে হোটেল সব বন্ধ হয়ে গেছে, এতো রাতে খাবার পাওয়া সম্ভব না। তখন সে রাতে সবাই না খেয়ে কাটাবে।

এমন কাণ্ড জামাল ভাই সত্যি সত্যি করতেন, যখন তিনি নতুন নতুন রান্না করা শুরু করেছিলেন। দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ইদানীং তার রান্না থেকে এই শিল্প হারিয়ে যাচ্ছে আর শিল্প হারিয়ে রান্নাটা বিরস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একবার জনপ্রিয় হয়ে গেলে শিল্পী তার শিল্প হারিয়ে ফেললেও জনপ্রিয়তা কিছু কমে যায় না। এখনও জামাল ভাই রান্নাঘরে ঢুকলে ভক্তরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে।

রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখলাম ভক্ত পরিবেষ্টিত জামাল ভাই রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। রান্নার সাথে সাথে তুমুল হৈ চৈ হট্টগোল হাসাহাসি আর খেঁকাখেঁকি চলছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতে লাফিয়ে উঠলো রুবেল, "আরে রানা ভাই জানেন না তো কি কাণ্ড হয়েছে। আজকে ফাটিয়ে খানাদানা।"

"বটে! উপলক্ষটা কি?"

"রফিক ভাই বিরাট দাও মেরেছে। একেবারে ফাটিয়ে ফেলেছে।"

"দাওয়ের উল্টো দিক দিয়ে মেরেছে নাকি? ফাটলো কি করে? কেউ

মরেনি তো?"

"না কেউ মরেনি। মরলে কি আর খাওয়া দাওয়া হতো? অবশ্য সেটাও একটা আনন্দের ব্যাপার হতো, একজন কমতো।"

"দূর একজন কমলে কি আর এমন আনন্দের ব্যাপার হতো? একজনে কিছু আসতো যেতো না। অবশ্য তুমি মরলে আলাদা ব্যাপার। তুমি একাই এক কোটি।"

বলতে বলতে আমি রফিক ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। রফিক ভাই একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ, বেশিরভাগ সময়ে ঘরের মধ্যে একা একা থাকেন। কারো সাথে কথা বলতে হলে উনি সঙ্কুচিত বোধ করেন। চাকরির চেষ্টা করছেন, এখনও সেদিকে সুবিধে হয়নি। কয়েকটা টিউশনি করেন। সব সময় নিজেকে তুচ্ছ ভেবে সঙ্কুচিত হয়ে থাকাটা উনার স্বভাব হয়ে গেছে। উনি দাও মেরে কিছু একটা ফাটিয়েছেন ব্যাপারটা আমার কেমন যেনো অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো।

"রফিক ভাই, কি ব্যাপার? দাও মেরে নাকি ফাটিয়ে ফেলেছেন? কি ফাটালেন? ডাব নাকি?"

রফিক ভাই হেসে ফেললেন। আমি আবার বললাম, "খাওয়া দাওয়া কিসের?"

রফিক ভাই লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, "এই তো রানা ভাই শেয়ার বিক্রি করে কিছু লাভ হলো তাই ভাবলাম সবাই মিলে একটু খাওয়া দাওয়া করা যাক।"

রফিক ভাইয়ের ঐ এক স্বভাব। ছোট বড় সবাইকে তিনি আপনি করে বলেন।

বললাম, "দারুণ তো। আপনি যে শেয়ার ব্যবসা করছেন তাই তো জানতাম না।"

"না ব্যবসা তেমন আহামরি কিছু না। অল্প কিছু শেয়ার কিনে রেখেছিলাম। দেখলাম ভালোই দাম বেড়েছে, বিক্রি করে দিলাম। সাতান্ন হাজার টাকা লাভ হলো। এতো টাকা আমি কখনো একসঙ্গে দেখিনি জানেন রানা ভাই।"

"আমিও দেখিনি। আপনি তো সাংঘাতিক কাণ্ড করেছেন।"

রফিক ভাই লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলেন। রুবেল চিৎকার করে জানালো খাবার তৈরি। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে ডাইনিংয়ে জড়ো হলাম। ডাইনিংটা বেশি বড় না। সবাই মিলে একসাথে বসে খাওয়া যায় না। এরকম উপলক্ষ হলে আমরা সবাই প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই।

টেবিলের উপর খাবার সাজিয়ে জামাল ভাই সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,

"আজ আমাদের খাওয়া হচ্ছে বুফে সিস্টেমে। টেবিলে সব দেয়া আছে, যার যতো ইচ্ছা নিয়ে খাবে। তবে সবজি দু চামচের বেশি নেয়া যাবে না। আর এক প্লেট পোলাউ, একটা রোস্ট আর তিন টুকরা গরুর মাংসের বেশি কেউ নিতে পারবে না। আর যেহেতু একজন ঝোল বেশি নিলে আরেকজনের কম পড়ে যেতে পারে, তাই কে কতটুকু ঝোল নিলো সেটা দেখা হবে। তবে হ্যাঁ, পাশের জনের কাছ থেকে যে যতো ইচ্ছা কেড়ে নিতে পারে, সেটায় আমার কোনো আপত্তি নেই।"

বলে জামাল ভাই আমাদের শুরু করতে বললেন। তিনি টেবিলের সবচেয়ে কাছে, কাজেই তিনি নিজে শুরু করলেন সবার আগে। আমরা তার দিকে ট্যারা চোখে চেয়ে রইলাম। আমাদের সন্দেহ হচ্ছিলো যে তিনি বেশি নিবেন, আর হলোও তাই। মুরগীর দুটো রোস্ট তুলে নিতেই আমরা তার ঘাড়ে চেপে বসলাম। জামাল ভাই প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের ঘাড় থেকে নেমে যেতে বললেন আর বললেন যে তিনি যেহেতু রান্না করেছেন কাজেই চেখে দেখার অধিকার তার আছে। রান্নার সময় রাঁধুনিকে চেখে দেখতে হয়, না হলে রান্না কেমন হচ্ছে সে বুঝবে কি করে? একটা রোস্ট তিনি নিয়েছেন খাবার জন্য, আর একটা চেখে দেখার জন্য।

"সরে যা বদমাশরা, ঘাড়ে চেপে আছিস কেনো? আমি রান্না করেছি আমি চেখে দেখবো না? চেখে না দেখলে বুঝবো কি করে রান্না কেমন হচ্ছে?"

তার কথায় যুক্তি আছে বলে আমাদের মনে হলো। যদিও আমাদের ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছিলো যে তিনি আমাদের কলা দেখানোর চেষ্টা করছেন। রান্না তো হয়ে গেছে, এখন আর চেখে দেখা কি? কিন্তু সত্যিই তিনি আমাদের কলা দেখানোর চেষ্টা করছেন কিনা সে বিষয়ে আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না। তাই আমরা তার ঘাড় থেকে নেমে গেলাম আর বিষয়টা পড়ে মীমাংসার জন্য রেখে দিলাম।

জামাল ভাই খেতে খেতে বললেন, "লিটু, খাবার কেমন হয়েছে?"

লিটু ভাই কবিতা লেখেন। কবি মানুষগুলোকে নিয়ে অন্যরা হাসাহাসি করে, সেটাই দস্তুর। হয়তো নিজেরা যে কথাগুলো বলতে পারে না কবিরা সেগুলো বলে ফেলে বলেই হাসাহাসি, নাকি কিসের জন্য কি কে জানে। তবে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আশেপাশে কবি প্রকৃতির কেউ থাকলে যতভাবে পারা যায় তাকে খুঁচিয়ে যাওয়া। লিটু ভাই সেটা ভালো করেই জানেন। জানেন যে এই প্রশ্নের উত্তরে তাকে এমন কিছু বলতে হবে যাতে সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে পারে। তিনি গভীর আবেগে ভেসে যাওয়ার ভঙ্গি করে বলতে শুরু

করলেন, "উম... খাবার হয়েছে দারুণ এক বিষণ্ন..."

"দাঁড়াও দাঁড়াও, ওভাবে বলো না। একটা একটা করে বলো। আচ্ছা বলো, সবজিটা কেমন হয়েছে?"

"আহা সবজির কথা আর কি বলবো, এটা খাওয়া এক অসাধারণ অনুভূতি। এ যেনো জীবনানন্দের কবিতার মত। কেমন যে হয়েছে বোঝা যায় না কিন্তু চিবোতে ভালো লাগে। জাবর কাটতে বোধহয় আরো ভালো হবে। আর গরুর মাংস, উম... সে এক ঝাল মহাকাব্য, যেনো নজরুল..."

"বটে! রোস্ট কেমন হয়েছে? রোস্ট।"

"রোস্ট হয়েছে দস্তয়ভস্কির ক্লাসিক উপন্যাসের মত, শেষ করার পর মনে হয় এ আমি কি খেলাম? অসাধারণ!"

"বাপরে, কবিতা থেকে এক লাফে উপন্যাস! পোলাউটা কেমন হয়েছে হে? পোলাউ?"

"আহা পোলাউয়ের কথা আর বলো না। এ একেবারে জসিমউদ্দিনের কবিতার মতো নস্টালজিক। 'আড়ংয়ের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই, বলেছি আমরা মুসলমানের আড়ং দেখিতে নাই'। আহা ছেলেবেলার সব স্মৃতি উঠে আসছে তোমার এই পোলাউ খেতে গিয়ে।"

"বটে। রবীন্দ্রনাথ কই গেলো হে?"

"কেনো? রবীন্দ্রনাথ দিয়ে কি দরকার তোমার? এমনিতে তোমার কমটা পড়লো কিসে শুনি?"

বলে লিটু ভাই সমর্থনের আশায় আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা সায় জানিয়ে বললাম যে যা হয়েছে তা কিছু কম হয়নি। তখন জামাল ভাই সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে এ যাত্রা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়াই তিনি চালিয়ে নিতে পারবেন।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই একটা বিষয়ে একমত হলাম যে খাওয়াটা চমৎকার হয়েছে। বললাম এমন স্বরে যেনো জামাল ভাইয়ের হাত দিয়ে এমন রান্না বের হওয়ায় আমর বিস্মিত। কিন্তু জামাল ভাই আমাদের বিস্ময়টাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন যার সৌজন্যে এই ভোজসভা আমাদের উচিত তার নামে জয়ধ্বনি করা।

আমাদের মধ্যে রুবেল ভালো শ্লোগান দিতে পারে। জয়ধ্বনি করার দায়িত্বটা আমরা ওর উপর ছেড়ে দিলাম। সে চিৎকার করে বললো, "তিন চিৎকার শেয়ার বাজারের জন্য..."

আমরা চিৎকার করলাম, "হৈ হৈ হৈ রে..."

"তিন চিৎকার রফিক ভাইয়ের জন্য..."
"হৈ হৈ হৈ রে..."

চার

আমরা হিসেব করে দেখলাম, আমাদের যা পুঁজি তাতে শেয়ার ব্যবসা হয়তো করা যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যবসাটার যা অবস্থা তাতে করে তাকে অপমান করা হবে। এখন হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অনেক টাকা ধরে ফেলার সময়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অনেক টাকা ধরতে হলে অনেক টাকা নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয়। বস্তা ভর্তি টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে উড়িয়ে দিতে হবে আর নেমে আসতে আসতে সে টাকা কয়েক বস্তা হয়ে যাবে। আমরা যদি সেখানে গিয়ে দুটাকা উড়াই তবে বড়জোর তিনটাকাই না হয় ফেরত পেতে পারি। কিন্তু তাতে কি মন ভরে? যখন সবাই পোলাউ কোর্মা খায় তখন ডাল-ভাত কি মুখে রোচে?

মুন্না বললো আমাদের ডাকাতি করা উচিত। ডাকাতি করে অনেক টাকা ছিনিয়ে নিয়ে শেয়ার বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

"ধর ডাকাতি করে একবারে কোটি খানেক টাকা পেয়ে গেলাম। ঐ টাকা নিয়ে আমরা শেয়ার বাজারে লাফ দিয়ে পড়বো। কয়েক দিনের মধ্যে দেখবি টাকা ডাবল হয়ে গেছে।"

মুন্নার বুদ্ধিটা আমার পছন্দ হলো না। আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম যে এতে দুটো সমস্যা আছে। প্রথমত এতে করে সত্যিকার ডাকাতরা বোকা হয়ে যেতে পারে। পত্রিকায় দেখেছি চোর ডাকাতরা সবাই চুরি ডাকাতি ছেড়ে শেয়ার ব্যবসায় নেমে গেছে। এই অবস্থায় আমরা যদি ডাকাতি করতে লেগে যাই তাহলে তারা কি ভাববে?

"আর দ্বিতীয় কারণটা কি?" মুন্না প্রশ্ন করলো।

"দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে... হুম।" আমি বললাম। "ডাকাতিই যদি করি তাহলে শেয়ার ব্যবসা করতে যাবো কোন দুঃখে?"

মুন্না হে হে করে হাসলো খানিক। সে অল্পতেই বেশি হাসে। তার হাসির

ধরনও বিচিত্র। কখনও হে হে কখনো হো হো আবার কখনো খো খো খো। অনেকক্ষণ ধরে হা হা হো হো করে হাসার পর সে বললো, "আরে গাধা, আমরা কি আর সারাজীবন ডাকাতি করে বেড়াবো? আমরা ডাকাতি করবো মূলধন জোগাড় করার জন্য। একটা ভালো কাজ করার জন্য ছোট খাটো দু' একটা খারাপ কাজ ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।"

আমি মাথা চুলকে বললাম যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখনও স্থির কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারিনি কাজেই এটা করতে আমার আপত্তি আছে। তবে আমার যেহেতু মনে হয় জীবনে সবরকম অভিজ্ঞতাই নিয়ে রাখা দরকার, মরবার আগে নিজেকে অভিজ্ঞতার ভারে ন্যুব্জ একজন বোকা বৃদ্ধ হিসেবে দেখা বিষয়টা খারাপ না, কাজেই মুন্না যদি আমাদের যা আছে তাই নিয়ে শেয়ার বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় আমার আপত্তি নেই। এতে করে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার সমৃদ্ধ হবে আর আমরা নিজেকে জ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পারবো। মুন্না এতে আপত্তির কিছু দেখলো না। অতএব আমরা একমত হলাম যে এই মুহূর্তে আমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে আমরা শেয়ার বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

মতিঝিলে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে আমরা মোস্তাকদের খুঁজে বের করলাম। স্টক এক্সচেঞ্জের পাশেই ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা সেল সেল বলে চিল্লাচ্ছিলো। আমাদের দেখে বললো, "তাহলে তোরা শেয়ার কিনবি?"

"হুম।" আমরা উত্তর দিলাম।

"বেশ। আমরা হচ্ছি এ লাইনে তোদের গুরু। নে পায়ের ধুলো নে।"

বলে মোস্তাক ওর পা বাড়িয়ে দিলো। আমরা ওর পায়ের দিকে চেয়ে ধুলো দেখতে পেলাম না। যা দেখলাম তা হচ্ছে প্যাঁচ প্যাঁচে কাঁদা। সে বোধহয় কোথাও পচা কাঁদার মধ্যে পা ডুবিয়ে দিয়েছিলো, জুতোর সাথে প্যাঁচ প্যাঁচে কাঁদা লেগে রয়েছে। দেখে আমাদের শরীর গুলিয়ে উঠলো। আমরা ওকে বলে দিলাম যে ওর ঐ পায়ের ধুলো নেয়ার চাইতে আমরা বরং ব্যবসার চিন্তা বাদ দিবো। উত্তরে সে রেগে গিয়ে আমাদের জাহান্নামে যেতে বলে দিলো।

"জাহান্নামে যা বেটারা। তোরা গুরু মানিস না কিছু না, তোদের দিয়ে ব্যবসা হবে না।"

আমরা বললাম যে ওদের গুরুগিরি আমাদের দরকার নেই, ব্যবসা কি করে করতে হয় সেটা আমরা ওদের দেখিয়ে দিবো। এক্ষুণি শেয়ার কিনে দেখিয়ে দিবো যে আমরাও পারি।

"পারবো না বলছিস? দাঁড়া, এক্ষুণি শেয়ার কিনে তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

কি ভাবিস তোরা আমাদের?"

আমাদের কথা শুনে ওরা উল্টোদিক ঘুরে হাসতে লাগলো।

"কেনাটা এমন কি কঠিন?" মোস্তাক বললো। "শেয়ার কেনা কঠিন কিছু না। সবাই কিনতে পারে। কিন্তু সেটা বিক্রি করে লাভ করাটাই হচ্ছে আসল। সেটা সবাই পারে না।"

"বললেই হলো সবাই পারে না? সবাই না পারলেও আমরা পারি। দাঁড়া, এক্ষুণি রাস্তার এ মাথা থেকে শেয়ার কিনে ও মাথায় গিয়ে লাভে বিক্রি করে তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।"

বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এখানে আট টাকা দামের শেয়ার যেমন আছে, তেমনি আবার ষোল হাজার টাকার শেয়ারও আছে। দামি শেয়ার কিনলে তাড়াতাড়ি লাভ করা যায়, কারণ ঐসব শেয়ারের দাম দিনে তিনশো-চারশো বা তার চেয়েও বেশি বাড়ে। কিন্তু আমাদের পুঁজি দিয়ে দামি শেয়ার কেনা সম্ভব না। আমরা টাইকো নিটিং নামে একটা কোম্পানির শেয়ার কিনবো বলে ঠিক করলাম। গতকাল স্টক এক্সচেঞ্জে টাইকোর শেয়ার আটান্ন টাকা করে বিক্রি হয়েছে। দাম মোটামুটি কম, আর প্রায় প্রতিদিন দুই-তিন টাকা করে বাড়ে বলে বাজারে শেয়ারটার চাহিদা রয়েছে। আমরা হিসেব করে দেখেছি আমরা যদি ষাট টাকা করে টাইকোর এক লক্ষ শেয়ার কিনি আর পরের দিন যদি সেটার দাম তিন টাকা বাড়ে, তবে তেষট্টি টাকা করে বিক্রি করে একদিনে আমাদের লাভ হবে তিন লক্ষ টাকা। একদিনের লাভ হিসেবে বেশ ভালো পরিমাণ টাকা। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কাছে এক লক্ষ শেয়ার কেনার টাকা নেই। আমরা বড়জোর ঐ দামে শ' দুই শেয়ার কিনতে পারি। আমরা সেটাই করবো ঠিক করলাম। প্রথমবার হিসেবে আমরা একশো শেয়ার কিনবো। দুই বা তিনদিন পরে দশ টাকা বেশি দামে সেটাকে বিক্রি করে দিবো। আমাদের লাভ হবে এক হাজার টাকা। প্রথম ব্যবসা হিসেবে মন্দ না।

আমরা এভাবেই ব্যাপারটা শুরু করলাম। ব্যবসাটা আমাদের খুব সহজ বলে মনে হলো আর সে কারণে বিষয়টাকে আমরা ছোট করে দেখলাম। কার্ব মার্কেটে টাইকো কোম্পানির শেয়ার প্রচুর, খুব সহজেই আমরা কিনতে পারবো ভেবে পুরো বিষয়টাকে আমরা হাল্কা ভাবে নিলাম। ফলে আমরা শুরু করলাম গুরুত্ব না দিয়ে, হেলা ফেলা করে। একজন বিক্রেতাকে টাইকোর শেয়ার হাতে সেল সেল বলে চিৎকার করতে দেখে কাছে গিয়ে আমরা আস্তে করে তার কাঁধে টোকা দিয়ে দাম কতো জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো আশি টাকা। শুনে প্রথমে আমরা লাফিয়ে উঠলাম। তারপর এমন একটা ভঙ্গি করলাম যেনো পাগলের

প্রলাপ শুনছি। আমি আর মুন্না মুখ টিপে হেসে পরস্পরকে বললাম যে পাগলে বলে কি!

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের হাসি মিলিয়ে গেলো, আমাদের গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। আর কেউ অবশ্য আশি টাকা চাইলো না, কিন্তু পুরো কার্ব মার্কেট এ মাথা থেকে ও মাথা চষে ফেলেও আমরা পঁয়ষট্টি টাকার নীচে দাম পেলাম না। ওহ কি বদ, কি শয়তান এই বিক্রেতাগুলো! সব হচ্ছে বদমাশ আর আর লোক ঠকাতে ওস্তাদ। বদমাশগুলো নিশ্চয়ই একসাথে যুক্তি করে এসেছে যে কেউ পঁয়ষট্টির নীচে বেচবে না। এদের শয়তানি দেখে আমাদের পিত্তি জ্বলে গেলো। আমরা যখন তাদেরকে ষাট টাকা দাম বলছিলাম তখন তারা যে হাসি দিচ্ছিলো সে হাসিই যে কোনো নিরীহ নির্বিরোধী মানুষকে খেপিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আমাদের ইচ্ছে হচ্ছিলো শেয়ারগুলো আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিই আর বলি যে তারা শেয়ার ব্যবসা করার উপযুক্ত না। হ্যাঁ, সেটাই হতো তাদের উপযুক্ত শাস্তি। সেটা করতে পারলেই আমরা শান্তি পেতাম। কিন্তু আমাদের ভদ্রতাবোধ আমাদের বাঁধা দিলো আর আমাদের মনে হচ্ছিলো যে সেটা করতে গেলে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। আমাদের তখন জেদ চেপে গেলো। আমরা ঠিক করলাম কিছুতেই ষাট টাকার বেশি দিয়ে টাইকোর শেয়ার কিনবো না। ফলে আমরা প্রত্যেকটা বিক্রেতার কাছে গিয়ে দাম শুনতে লাগলাম। ব্যাপারটা এমন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেলো যে কে কতো দাম বলছে আমরা সেটাও শুনছি না। আমরা একজনকে টোকা দিয়ে দাম জিজ্ঞেস করছি, সে দাম বলতে একটা মন্তব্য করে অন্য আরেকজনকে টোকা দিচ্ছি।

"ভাই কতো করে?"

"ছেষট্টি।"

"ঊনষাট হবে?"

"এক দাম। নিলে নেন, না নিলে কিছু করতে পারবো না।"

...

"ও ভাই কতো?"

"সত্তর।"

"ও বাবা, এ দেখি তালগাছ, সব গাছ ছাড়িয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে..."

"তাহলে আপনিই বলেন কতো দিবেন?"

"ষাট।"

"নারে ভাই, তেষট্টি বলছে তাই দিচ্ছি না।"

...

"কতো করে বিক্রি করবেন ভাই?"
"কতো দিতে চান আপনি?"
"আপনি দাম না বললে আমি বলি কি করে?"
"বলেন না, দাম তো জানেনই।"
"ষাট।"
"পারি না।"

...

অনেকক্ষণ ধরে এরকম চলার পর আমাদের মনে হলো শেয়ার না কিনলে আমরা বাঁচবো না। বাঁচতে হলে শেয়ার আমাদের কিনতেই হবে এবং সেটা এখনই।

"দূর, আর ভাল্লাগে না।" মুন্না বললো। "চল ষাট টাকার ধান্দা বাদ দিয়ে সবচেয়ে কম যেটা পাই সেটাতেই কিনে ফেলি।"

"সবচেয়ে কম আমরা কতো পেয়েছি এখন পর্যন্ত?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মুন্না মনে করতে পারলো না। আমার মনে হলো সবচেয়ে কম আমরা বাষট্টি টাকা পেয়েছি কিন্তু মুন্নার ধারণা একজন আমাদের একষট্টি টাকা আট আনা বলেছে। কিন্তু কে বলেছে এবং তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে বলতে পারলো না। সে ঐ লোককে আবার খুঁজে বের করার প্রস্তাব দিলো। আমি বললাম যে আট আনার জন্য আমি আর দৌড়াতে পারবো না। একদিনে আমি যথেষ্ট দৌড়ে ফেলেছি এবং এরপরে আরো দৌড়োতে হলে আমি অলিম্পিকে গিয়ে ম্যারাথনে নাম লেখাবো।

আমাদের কানের কাছেই এক বিক্রেতা টাইকোর শেয়ার হাতে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করছিলো। আমরা তার কাছ থেকে বাষট্টি টাকা করে একশো শেয়ার কিনে ফেললাম। না, প্রথমেই আমরা কিনলাম না। প্রথমে মুন্না শেয়ারটা হাতে নিলো। তারপর করলো কি- আঙুলে থুথু লাগিয়ে শেয়ারটার গায়ে দিলো ডলা।

মুন্নার কাজটাকে আমি বুদ্ধিমানের কাজই বলবো। মাঝে মাঝে কি করে যেনো সে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করে ফেলে। তখন তার বুদ্ধির বহর দেখে আমরা অবাক বনে যাই। এটাও তার সেরকমই একটা কাজ বলে আমার ধারণা। কারণ আমরা শুনেছি ইতিমধ্যে অনেক কোম্পানির শেয়ারের নকল বেরিয়ে গেছে আর নকলগুলো এমন যে বোঝা যায় না সেগুলো নকল। এটা আমরা শুনেছিলাম মোস্তাকের কাছে। আমরা প্রথমটায় বলেছিলাম যে নকল যদি ধরা না যায় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। মোস্তাক বলেছিলো, "সমস্যা

আছে। বাঙালী একটা কিছু করতে যাবে আর তাতে দুই নম্বরি করবে না তা তো হয় না। অনেক কোম্পানি আছে যারা নিজেদের শেয়ারের নকল নিজেরাই বের করে। ঐ শেয়ার দেখে জীবনেও বুঝবি না যে ওটা নকল। কিন্তু তুই যদি শেয়ারটা নিজের নামে করতে যাস তখন দেখবি সেটার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে অনেক নকল আছে যেগুলা কোম্পানি করে না, বাইরে থেকে অন্যেরা করে। ঐসব শেয়ারে থুথু লাগিয়ে ডলা দিলে রঙ উঠে যায়।"

বিক্রেতা হৈ হৈ করে বললো, "আরে করেন কি? থুথু দিয়ে ডলেন কেনো?"

মুন্না মুখ তুলে বললো, "দেখি নকল কিনা।"

"নকল না। নকল হলে আমি কানে ধরে শেয়ার বাজারে চক্কর দিবো।"

মুন্না বললো যে সে যদি শেয়ার ফেরত না নেয় তবে কানে ধরে চক্কর দিলে আমাদের কোনো লাভ হবে না। সে তার থুথু পরীক্ষার ফলাফল আমাকে দেখালো। দেখলাম রঙ ওঠেনি, যা উঠেছে তা হচ্ছে কাগজের গুঁড়ো। আমাদের মনে হলো শেয়ারটা নকল না। কিন্তু এভাবে থুথু লাগিয়ে ডলার ফলে গুঁড়ো উঠে সেটা দেখতে কেমন যেনো বদখত হয়ে গেলো। এরকম বদখত দেখতে শেয়ার আমরা নিতে পারি না। মুন্না আবদার জানিয়ে বললো শেয়ারটা পাল্টে দিতে। শুনে বিক্রেতা এমন বিস্মিত ভাবে তাকালো যে আমরা আর কথা না বাড়িয়ে শেয়ারটা নিয়ে সটকে পড়লাম।

মুন্না এক গাল হেসে আমার দিকে চেয়ে বললো, "বিসমিল্লাহ। হে হে, শুরু করলাম ব্যবসা, চল।"

বলেই সে দুহাতে শেয়ারটা মাথার উপরে তুলে বাঘের মতো হুংকার দিলো, "এই সেল সেল..."

কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা হুংকার শুনতে পছন্দ করে। তেমন একজন হুংকারপ্রিয় মানুষ উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলো। পিছন থেকে এসে মুন্নার ঘাড়ে টোকা দিয়ে জানতে চাইলো, "কতো?"

"পঁচাত্তর।" মুন্না গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, "দাম চাইলে বেশি করে চাইতে হয় বুঝলি। তাতে অন্যেরা ঘাবড়ে যায়। খবরদার কেউ দাম জানতে চাইলে কম বলবি না। ঘাড় ভেঙে দিবো তাহলে।"

বেশি দাম চাইলে কি লাভ সেটা অবশ্য আমি বুঝলাম না। অনেক দামাদামির পর ক্রেতা সর্বোচ্চ যে দাম বললো সেটা হচ্ছে বাষট্টি টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা হাতে হাতে লাভ। কিন্তু এতক্ষণ ধরে এতো

কাণ্ড করে শেয়ার কেনার পর পঞ্চাশ টাকা লাভ করাটা আমাদের কাছে একটু কম বলে মনে হচ্ছিলো। আমাদের মনে হলো আশেপাশের মানুষজন আমাদের লাভ দেখে হাসা হাসি করছে ফলে আমরা বেশ লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমরা ঐ দামে শেয়ার বিক্রি করবো না বলে ক্রেতাকে জানিয়ে দিলাম।

আমার মনে হলো আজকে শেয়ার বিক্রি করার চেষ্টা করার মানে হয় না কারণ ঐ পঞ্চাশ বা একশো টাকার বেশি লাভ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মুন্না বললো যে সে ব্যাপারটা দেখতে চায়। কাজেই শেয়ার হাতে নিয়ে সে সেল সেল বলে চেঁচাতে থাকলো। ক্রেতার অভাব নেই। হরদম কেউ না কেউ এসে দামাদামি করছে। কিন্তু ক্রেতাদের বদমায়েশি দেখে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য বদমায়েশ এই ক্রেতাগুলো! এরা যে এতদূর পর্যন্ত বদমাশ হতে পারে সেটা আমরা ধারণাই করতে পারিনি। এদের বদমায়েশি দেখে আমাদের গা জ্বলে গেলো। এরা এমন হাড়ে হাড়ে বজ্জাত যে কেউ বাষট্টি টাকার বেশি দাম বলে না। আসলে বাষট্টি টাকাই কেউ বলে না, সবাই ষাট টাকায় কিনতে চায়। নিশ্চয়ই সবাই এক হয়ে যুক্তি করে এখানে এসেছে। কি করে তারা সবাই এক হয়ে যুক্তি করে এলো সেটা ভেবে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের যে ওরা লাভ করতে দিবে না সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো। আমরা তাদের সত্তর টাকা দাম বলার পর তাদের মুখে তাচ্ছিল্যের যে ভঙ্গি হতে লাগলো, সেই ভঙ্গিই যে কারো মেজাজ হারিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো আমরা হচ্ছি পাগল আর আমাদের গিয়ে চিড়িয়াখানায় থাকা উচিত। তাদের এই ভাব আমাদের আরও খেপিয়ে তুলছিলো। মুন্না বললো যে এই ভাব দেখলেই তার মধ্যেকার বদ ইচ্ছাগুলো জেগে উঠছে। ইচ্ছে করছে এই লোকগুলোর সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে বলে যে এরা ব্যবসা করার উপযুক্ত নয়। এদের উচিত ব্যবসা করার চিন্তা বাদ দিয়ে ডোবায় গিয়ে মাছ ধরা।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটলো। এক ভদ্রলোক এসে আমাদের শেয়ারের দাম বললেন পঞ্চান্ন টাকা। এই এক কথাতেই মেজাজ হারিয়ে ফেললো মুন্না। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে বললো, "এহঃ পঞ্চান্ন টাকা! পঞ্চান্ন টাকার আমি ইয়ে করি..."

তারপর সে আবার ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বললো, "পঁয়ষট্টির এক পয়সা কমে বেচবো না।"

ভদ্রলোক মুখটা কাছে নিয়ে এসে গোপন কথা বলার ভঙ্গি করে বললেন, "ভাতিজা শোনো, ভিতরে (মানে স্টক এক্সচেঞ্জের যেখানে অফিশিয়ালি শেয়ার

কেনা বেচা হয়) আজকে টাইকোর দাম কমে গেছে। আমি আটান্ন টাকা দেই, এই বেলা বেচে ফেলো। কালকে যখন সবাই জানতে পারবে যে দাম কমে গেছে তখন কিন্তু আটান্ন টাকাও বেচতে পারবে না।"

মুন্না ভদ্রলোকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো, "কালকে বেচতেই হবে এমন কথা আছে? দাম বাড়ুক, তারপর বেচবো। দরকার হলে বিক্রিই করবো না। শেয়ারটাকে বাঁধিয়ে ছবির মতো ঘরে টাঙিয়ে সারাদিন সেটার দিকে চেয়ে থাকবো। আপনার কোনো সমস্যা?"

"না আমার আর সমস্যা কি? যাও ছবি বানিয়ে টাঙিয়ে রাখো। টাঙিয়ে সারাদিন সেটার দিকে চেয়ে থাকো। আমার কি?"

বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন। মুন্না বিড়বিড় করে গালি দিয়ে বললো, "কেমন বজ্জাত! বয়স্ক একজন মানুষ কেমন গড় গড় করে মিথ্যে কথা বলছে দেখ।"

"মিথ্যে কি করে বুঝলি?"

"না বোঝার কি? আরে বেটা ভিতরে যদি দাম কমেই যায় আর তাতে করে কালকে যদি কার্ব মার্কেটে দাম পঞ্চান্ন টাকা হয় তাহলে সে কালকে কিনলেই পারে। আজকে আটান্ন টাকায় কেনার জন্য ডিম পাড়া মুরগীর মতো তড়পাচ্ছে কেনো?"

মুন্নার কথায় যুক্তি আছে বলে আমার মনে হলো। সত্যিই তো, কালকে পঞ্চান্ন টাকা দাম হলে আজ সে আটান্ন টাকায় কিনতে চাচ্ছে কেনো? মুন্না বললো লোকটা হচ্ছে মহা ফেরেব্বাজ। মানুষকে গাধা পেয়েছে আর কি। ফেরেব্বাজি করে লাভ করতে চাচ্ছে।

ভিড়ের মধ্যে আমার কয়েকজন দূর সম্পর্কের মামাকে আসতে দেখে থমকে গেলাম। সম্পর্কে মামা হলেও এরা আমারই বয়সী। দেখলাম এরা ট্রেন বানিয়েছে। আহা, লোহা লক্কড় দিয়ে বানানো ট্রেন না। একজন আরেকজনের পিছনে ঘাড়ে হাত দিয়ে ট্রেন বানিয়ে যাচ্ছে। তবে ট্রেনের মতো হেলে দুলে যাচ্ছে না, যাচ্ছে লাফাতে লাফাতে। আর মুখে সেল সেল বলে আওয়াজ করছে। আমাকে দেখে ওরা থেমে গেলো। ফিরোজ মামা চেঁচিয়ে বললো, "আরে রানা মামু, চাকা চাকা বুম বুম পা পা... মাইরি, যা একটা ব্যবসা না! তোমার ব্যবসা কেমন হচ্ছে?"

ফিরোজ মামার ঐ হলো মুদ্রাদোষ। ফুর্তিতে থাকলেই সে বলবে- চাকা চাকা বুম বুম পা পা।

"ব্যবসা হচ্ছে সাংঘাতিক।" আমি উত্তর দিলাম। "চাইলে আমরা পঞ্চাশ

টাকা লাভ এর মধ্যে করে ফেলতে পারতাম কিন্তু টাকাটা নিয়ে কোথায় রাখবো সেটা এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি বলে আমরা আরেকটু ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। টাকা রাখার জন্য বড়সড় একটা নিরাপদ সিন্দুক জাতীয় কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলেই আমরা লাভ করা শুরু করে দিবো।"

"নাকি?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা মামা, প্রতিদিন আমরা যদি এরকম পঞ্চাশ টাকা করে লাভ করতে থাকি তাহলে বড়লোক হতে আমাদের কতদিন লাগবে?"

"কেনো, পঞ্চাশ টাকা লাভ করাটাই কি যথেষ্ট বড়লোকি না? এরপর আরও লাভ করতে হবে? আরও বড়লোক হতে হবে? কেনো, অত বড়লোক হয়ে তুমি করবেটা কি শুনি? ললিপপের দোকান দিবে? শোনো মামা, অল্পনং তুষ্টনং সুখং। অল্পে তুষ্ট হলেই সুখী হওয়া যায়।"

ফিরোজ মামার কথা শুনে আমার মন দ্রবীভূত হয়ে পড়লো। এরকম কথা শুনলে সব সময়ই আমার মন নরম হয়ে যায়, মনের মধ্যে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি হয় আর সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চলে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এখনও আমার তাই হলো। কোমল অনুভূতিতে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো আর আবেগে আমার চোখে পানি চলে এলো। আমি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললাম যে যা করেছি ভুল করেছি, এখন থেকে আর লোভ করবো না, পঞ্চাশ টাকার বেশি লাভ করার চিন্তা আমি একেবারে বাদ দিয়ে দিলাম আর কোনো ললিপপের দোকানও আমি দিবো না। যদিও ললিপপের দোকান দেয়ার চিন্তা আমার কোনো কালে ছিলো না; আর আসলে ললিপপের দোকান দেয়া বলতে ফিরোজ মামা কি বুঝিয়েছে সেটা আমি ভালো করে জানি না।

খুশি হয়ে ফিরোজ মামারা আবার ট্রেন বানিয়ে চলে গেলো। মুন্না প্রশ্ন করলো, "তোর মামা পাগল নাকি?"

"কেনো?"

"পাগল ছাড়া কি? বলে কিনা অল্পনং তুষ্টনং সুখং! আরে পাগল, অল্পনং তুষ্টনং সুখং বটে বাট নো বড়ং কর্মনং। অল্পে তুষ্ট হলে সুখী হওয়া যায় বটে কিন্তু বড় কিছু করা যায় না। কোন আক্কেলে তুই বলতে গেলি যে পঞ্চাশ টাকার বেশি লাভ করবি না? পঞ্চাশ টাকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর রাস্তায় উড়াতে গেলে আমাদের ধরে গণপিটুনি দিবে না?"

আমাকে স্বীকার করতে হলো যে এমন করতে গেলে পিটুনি খাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। টাকা উড়তে দেখে হুমড়ি খেয়ে ছুটে এসে

লোকগুলো যখন দেখবে যে পঞ্চাশ টাকা উড়েই শেষ তখন নিশ্চয়ই তারা আমাদের কোলে করে আদর করতে বসে যাবে না।

আমাদের মনে হলো আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে, এই বেলা ক্ষ্যান্ত দেয়া যাক। আমরা বাড়ির পথ ধরলাম। ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে অল্পের জন্য পা দিয়ে শেয়ার মাড়িয়ে দেয়া থেকে আমি রক্ষা পেলাম। এই ব্যাপারটা মারাত্মক। ভিড়ের মধ্যে রাস্তার উপরে কিছু লোক বিভিন্নরকম শেয়ার সাজিয়ে বসে থাকে। আপনি যদি হাঁটতে গিয়ে ভুলক্রমে কোনো শেয়ার পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন তবেই সর্বনাশ। ওরা ক্যাঁক করে আপনাকে চেপে ধরে বলবে, "ঐ মিয়া, দেইখা হাঁটতে পারেন না? চক্ষু কি খুইলা বাড়িত রাইখা আসেন নাকি?"

ঘাবড়ে গিয়ে আপনি অতি ভদ্রভাবে বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, "ভাই এটা তো শেয়ার সাজিয়ে রাখার জায়গা না।"

"আরে কি কয় শেয়ার রাখার জায়গা না? শেয়ার রাখার জন্য কি তাজমহল লাগবো নি? যান যান, পরেরবার সাবধানে হাঁইটেন কইলাম, নাইলে কিন্তু চক্ষু খুইলা হাতে ধরাই দিমু, যাতে নীচের জিনিস ভালো দেখতে পান।"

পাঁচ

পরের দিন আমাদের অবস্থা যা দাঁড়ালো তাকে প্রচলিত বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয়- হালুয়া টাইট। হালুয়া টাইট কথাটার মানে আমি ভালো করে বুঝি না। হালুয়া আবার টাইট হয় কি করে? হালুয়া শক্ত হতে পারে, কঠিন হতে পারে, কিন্তু টাইট কেমন করে হয়? আমার এক কলেজের সহপাঠী, যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়ছে আর ভবিষ্যতে কঠিন ও দুর্বোধ্য ভাষায় কালজয়ী সাহিত্য রচনার জন্য তৈরি হচ্ছে এবং প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকেই সমকালীন যাবতীয় সাহিত্যকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছে, তার কাছে একবার ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

"আচ্ছা হালুয়া টাইট কি করে হয় একটু বুঝিয়ে দে তো।"

সে অনেকক্ষণ ধরে মাথা চুলকালো, গালে হাত দিয়ে উদাসভাবে বসে

রইলো, উঠে ঘরের মধ্যে হাঁটা হাঁটি করলো। তারপর বললো, "আমার মনে হয় কথাটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে হালুয়া বলতে পেটের কথা বোঝানো হয়েছে। মানে কোষ্ঠ আর কি..."

"তুই বলতে চাচ্ছিস কোষ্ঠকে হালুয়া বলছে?"

"হ্যাঁ।"

কোষ্ঠকে কারো কাছে হালুয়া মনে হতে পারে সেটা জেনে আমি বিস্মিত হয়ে পড়লাম। ঐ লোক পাগল না আমার সহপাঠী বুঝতে না পেরে বললাম, "যাক বাদ দে। আচ্ছা এবার বল লেজে গোবরে হয় কি করে? এ কথাটা কোথা থেকে আসলো?"

সে রেগে গিয়ে বললো, "হ্যাঁ আমার আর কাজ নেই বসে বসে তোকে এইসব বুঝাই আর কি। যা বাড়ি যা। বাড়ি গিয়ে কান চুলকা।"

আমি বললাম যে সে না জানলে বলে দিলেই পারে যে জানে না। তা না বলে কান চুলকাতে বলাটা নিতান্ত হাস্যকর।

উত্তরে সে বললো, "ভাগ।"

যাই হোক, পরের দিন আমাদের অবস্থা হলো হালুয়া টাইট বা লেজে গোবরে বা ঐ জাতীয় কিছু। দিনটা শুরু হয়েছিলো চমৎকারভাবে। সকালে পত্রিকায় দেখলাম আমাদের শেয়ারের দাম চার টাকা বেড়ে বাষট্টি টাকা হয়েছে। তাহলে কার্ব মার্কেটে আজকে আরো বেশি দামে বিক্রি হওয়ার কথা। মতিঝিলে যাওয়ার জন্য আমাদের যে সময়ে বের হওয়ার কথা তার অনেক আগেই মুন্না আমার মেসে এসে হাজির হলো। এই ব্যাপারটা আমি অভূতপূর্ব বলবো। সময়ের আগে মুন্না কোথাও যায় না, এমনকি সময় মতও না। সে সব সময় দেরি করে আর সেটাই তার স্বভাব। সকাল দশটায় তার কোথাও যাওয়ার থাকলে সে এগারোটা বিশে গিয়ে বলে যে একটু দেরি হয়ে গেলো। কিছু মানুষ থাকে যাদের স্বভাবই এমন দেরি করা। যেমন ছিলো আমার কলেজের সহপাঠী রাসেল। কলেজে আমাদের ক্লাস শুরু হতো সকাল আটটায়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেলো রাসেল প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ মিনিট দেরি করে আসে। একদিন আমাদের ক্লাস টিচার তাকে চেপে ধরলেন।

"কি হে? প্রতিদিন দেরি করে আসো তোমার ব্যাপারটা কি?"

রাসেল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, "স্যার আমার বাসা অনেক দূরে তাই একটু দেরি হয়ে যায়।"

"বটে। আচ্ছা দেখা যাবে তোমার বাসা কতো দূরে।"

রবিবারে আমাদের ক্লাস শুরু হতো পৌনে ন'টায়। রবিবারে রাসেল সময়

মতো আসে কিনা সেটা আমরা আগে লক্ষ্য করিনি। কিন্তু পরের রবিবারে আমরা ওঁত পেতে রইলাম। চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে স্যার দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। পৌনে ন'টা বাজার কয়েক মিনিট পরও যখন রাসেলকে দেখা গেলো না তখন তিনি পড়ানো শুরু করে দিলেন। পঁয়ত্রিশ মিনিট পর রাসেল এসে দরজায় দাঁড়ালো।

"আসবো স্যার?"

"হ্যাঁ, আসবে তো বটেই।" স্যার বললেন। "কিন্তু তুমি কি বাসা পাল্টেছো নাকি হে? আরো দূরে বাসা নিয়েছ? আরো আরো দূরে?"

রাসেলের বাসা সত্যিই অনেক দূরে কিনা সেটা আমরা জানতে পারিনি। তবে মুন্নার দেরি করার পিছনে যৌক্তিক কারণ রয়েছে। সে থাকে চারতলায়। তাদের বাসার দোতলায় দীপ্তিরা থাকে। দীপ্তি মেয়েটার জন্য মুন্নার হৃদয়ে আবার একটু কোমল অনুভূতি আছে। আর কি কারণে যেনো তার ধারণা, দীপ্তির হৃদয়েও তার জন্য কোমল অনুভূতি রয়েছে এবং সে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠে বা নামে তখন দীপ্তি দরজার চিপা দিয়ে চুপে চুপে তাকে দেখে। দীপ্তি যেনো তাকে ভালো করে দেখতে পায় সেই সুযোগটা দেয়ার জন্য মুন্নার সব সময় দেরি হয়ে যায়। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার কখনো জুতোর ফিতে বাঁধার কথা মনে থাকে না। দোতলায় এসে তার চোখে পড়ে যে জুতোয় ফিতে বাঁধা হয়নি। তখন সে ফিতে বাঁধতে শুরু করে আর সেটা করতে গিয়ে কি এক অদ্ভুত উপায়ে ফিতেটা সে পেঁচিয়ে ফেলে। ফলে পুরো ফিতে খুলে প্রথম থেকে আবার বাঁধতে শুরু করতে হয়। এভাবে ফিতে বাঁধতে তার সময় লেগে যায় অনেকক্ষণ। ফিতে বাঁধা শেষ করে সে বড় একটা শ্বাস ফেলে আর তারপর তার মনে পড়ে যে মানিব্যাগটা সঙ্গে নেয়া হয়নি। তখন সে আবার উপরে ওঠে। তিনতলায় ওঠার পর মনে পড়ে যে মানিব্যাগ সে ব্যবহার করে না, টাকা পয়সা তার পকেটেই থাকে আর যা নেওয়ার সে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। তখন সে আবার নেমে যায়। দোতলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাত কামড়ায় যেনো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু মাথায় আসছে না। ছাদের দিকে চেয়ে কপাল কুচকে সে হাত কামড়ায় অনেকক্ষণ। তারপর ঘুরে এক দৌড়ে চার তলায় গিয়ে নিজের বাসার দরজায় টোকা দেয়। তার মা দরজা খুলে বলেন, "কিরে? ফিরে এলি যে?"

"চা তো খাইনি। চা খেতে এলাম।"

"চা খাসনি মানে কি? তুই না একটু আগে চা খেলি?"

"ও খেয়েছি? আচ্ছা তাহলে আরেক কাপ খাই।"

বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে ঘুটুর ঘুটুর করে চা বানাতে শুরু করে। এক ফাকে যখন আশেপাশে কাউকে দেখতে পায় না তখন টুক করে চিনির কৌটাটা লুকিয়ে ফেলে বলে, "যাহ, চিনি নেই দেখি। যাই চিনি নিয়ে আসি।"

একটা ছোট বাটি হাতে সে দৌড়ে দোতলায় নেমে গিয়ে দীপ্তিদের বাসার দরজায় টোকা দেয়। কাজের বুয়া দরজা খুলে দিতে সে বলে, "খালাম্মা নাই?"

খালাম্মা, মানে দীপ্তির মা তখন দরজায় এসে দাঁড়ান আর সে বলে, "খালাম্মা আমাদের চিনি ফুরিয়ে গেছে, একটু চিনি দেয়া যাবে?"

খালাম্মা তখন চিনি আনতে চলে যান আর সে দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ দুটোকে ভিতরে পাঠিয়ে দেয়। চোখ দুটো ঘুরে ঘুরে কোথাও দীপ্তিকে দেখতে পায় না কিন্তু তার মনে হয় কোনো একটা ঘরের দরজার চিপা দিয়ে দীপ্তি তাকে ঠিকই দেখছে। খালাম্মা চিনি নিয়ে আসেন। চিনি হাতে বাসায় ফিরে এসে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে সে বলে, "দূর, কি জঘন্য চা।"

চা টা ফেলে দিয়ে সে দৌড়ে নীচে নেমে যায়। নীচতলায় নেমেই চিৎকার করে ওঠে, "ঐ রিকশা ঐ, যাবে নাকি?"

চিৎকারটা সে এমন জোরে করে যেনো দোতলা থেকে শোনা যায়। সেই সময় নীচতলায় কেউ থাকলে আশেপাশে তাকিয়ে কোনো রিকশা দেখতে পায় না। কিন্তু মুন্না 'ঐ দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে চিৎকার করতে করতে কোনো এক অদৃশ্য রিকশার দিকে তেড়ে যায়।

যাই হোক, আমরা বর্তমানে ফিরে আসি। মতিঝিলের উদ্দেশ্যে আমাদের যে সময়ে বের হওয়ার কথা তার অনেক আগেই মুন্না আমার মেসে এসে লাফাতে লাগলো। লাফাতে লাফাতে বললো যে আজকে আমাদের শেয়ার কম করে হলেও পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি হবে। বিক্রি হলেই তিনশো টাকা লাভ হয়ে যাবে। আমি বললাম তিনশো টাকা লাভ হলে যতটা লাফানো দরকার সে তার চেয়ে বেশি লাফাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

"আরে গাধা, আমাদের হচ্ছে অল্প পুঁজি।" মুন্না বললো। "এই পুঁজিতে একদিনে তিনশো টাকা লাভ হওয়াটা খারাপ কিসে? আর তাছাড়া আমরা কি তিনশো টাকাতে আটকে থাকবো নাকি? সবে তো শুরু করলাম। ব্যবসার হাল হকিকত একটু বুঝতে দে তারপর ফাটিয়ে ফেলবো। কথায় বলে- বড় চিন্তা করো কিন্তু ছোট করে শুরু করো। আমরা ছোট করে শুরু করলাম। কিন্তু আমাদের চিন্তা তো বড়ই আছে, নাকি? থিওরি অনুযায়ী আমরা ঠিক পথে চলছি কিনা বল।"

আমাকে মেনে নিতে হলো যে তত্ত্বমতে আমরা ঠিক পথে আছি। মুন্না খুশি

হয়ে বললো, "তবে? চল যাই।"

আমরা মতিঝিলের পথে বের হয়ে পড়লাম। কার্ব মার্কেটে ঢুকেই মুন্না আশি টাকা দাম হেঁকে একজনের পিলে চমকে দিলো। ঘাবড়ে গিয়ে লোকটা মিনমিন করে বললো যে সে বড়জোর আটান্ন টাকা দিতে পারে। মুন্না ক্ষেপে গিয়ে লোকটাকে পত্রিকা খুলে শেয়ারের দাম দেখিয়ে দিলো।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের লেজে গোবরে অবস্থাটা টের পেলাম। আমরা ভেবেছিলাম আমরা কার্ব মার্কেটে ঢুকবো, সত্তর টাকায় শেয়ারটা বিক্রি করে কিছুক্ষণ মোস্তাকদের সাথে গলাবাজি করে অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনে বাসায় ফিরে যাবো। এই ভেবে আমরা শুরু করেছিলাম খোশ মেজাজে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো এরকম- আমরা শেয়ার হাতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম আর লোকজন এসে আমাদের কাছে দাম শুনে চলে যেতে লাগলো। আমাদের মনে হলো দেশের সব মানুষ ইতিমধ্যে এসে দাম শুনে গেছে কিন্তু কেউ ষাট টাকার বেশি দাম বললো না। আমরা একটু ধন্দে পড়ে গেলাম। ব্যাপারটা এরকম হলো কেনো? স্টক এক্সচেঞ্জে কতো দামে শেয়ার কেনা বেচা হচ্ছে সেটা সাধারণত বিকেলের আগে জানা যায় না। বিকেলের দিকে জানা গেলেও কার্ব মার্কেটে সেটার খুব একটা প্রভাব পড়ে না। কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় দামটা আসার পর কার্ব মার্কেটে প্রভাবটা পড়ে। ফলে স্টক এক্সচেঞ্জে কোনো শেয়ারের দাম বাড়লে পরের দিন কার্ব মার্কেটে সেটার দাম বাড়ে। বা একদিন দাম কমে গেলে পরের দিন বাইরে কমে যায়। এই সূত্রমতে আমাদের শেয়ারের দাম বেশি হওয়া উচিত। তবে কেউ ষাট টাকার বেশি উঠছে না কেনো?

মুন্না চৌত্রিশ লক্ষ বারের মতো হাতের পত্রিকা খুলে আমাদের শেয়ারের দাম দেখিয়ে আমাকে শেয়ার ব্যবসার তত্ত্ব বুঝাতে লাগলো। আমি বিরক্ত হয়ে ওকে বলে দিলাম আমাকে শেয়ার ব্যবসার তত্ত্ব না বুঝিয়ে বরং পত্রিকাটা দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে কটকটিঅলার কাছে বিক্রি করে দিতে। তাতে আর কিছু না হোক কটকটি খাওয়া যাবে। শুনে সে করলো কি, পত্রিকাটা পেঁচিয়ে চোঙা বানিয়ে সেটা দিয়ে নিজের কপালে দিলো এক বাড়ি।

মোস্তাকরা যথারীতি স্টক এক্সচেঞ্জের পাশের ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাদের দেখে ওরা চোখ ট্যারা করে ফেললো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ওরা অমন চোখ ট্যারা করে আছে কেনো। উত্তরে তারা বললো যে আমরা নাকি তাদের হুমকি দিয়ে বলেছি যে ব্যবসায় আমাদের লাভ দেখে ওদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। সেই শুনে আগেই ওদের চোখ ট্যারা হয়ে গেছে। আমরা বললাম যে

ব্যবসার গতিপ্রকৃতি দেখে আমাদের নিজেদেরই চোখ ট্যারা হয়ে গেছে। শুনে ওদের ট্যারা চোখ ভালো হয়ে গেলো।

"কেনো, কি হলো আবার তোদের?"

"টাইকোর দাম বাড়ে না তো।"

"বাড়বে না কেনো। টাইকোর দাম তো তিনটাকা বেড়েছে।"

"আরে সে তো ভিতরে। কার্ব মার্কেটে তো ষাট টাকার বেশি দাম বলে না।"

"আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, টাইকোর দাম আগে কখনো ষাট টাকার বেশি ওঠেনি। এবারই প্রথম বাষট্টি টাকায় উঠলো বলে সবাই একটু ভয় পেয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। দুই এক দিনের মধ্যে দাম বেড়ে যাবে।"

আমরা বুঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম। ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে আমাদের খিদে পেয়ে গিয়েছিলো। খাওয়ার জন্য পাশের একটা হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড় এবং বয়গুলো এতো ব্যস্ত যে তাদের দম ফেলবার ফুসরত নেই। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর একজন বয়কে আমরা পাকড়াও করে কি আছে জানতে চাইলাম।

"কাচ্চি বিরিয়ানি, ভুনা খিচুড়ি, ভাত, মুরগী, খাসি, পাঙ্গাশ..."

"সিঙ্গাড়া নাই?"

"আছে।"

"ঐটাই দাও।" মুন্না বললো। "কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ার মতো ব্যবসা এখনও আমরা করিনি। করলে তখন খিচুড়ি দিয়ে কাচ্চি মাখিয়ে খেয়ে যাবো।"

আমরা ছিলাম পাঁচজন। বয় মাথা গুনে সিঙ্গাড়া দিয়ে গেলো। আমাদের জব্বর খিদে পেয়েছিলো ফলে সিঙ্গাড়াটা আমাদের চমৎকার মনে হলো। মুন্না বললো যে এতো ভালো সিঙ্গাড়া সে কখনও খায়নি। তার জীবনের খাওয়া শ্রেষ্ঠ সিঙ্গাড়া এটা।

"সত্যি?" মোস্তাক প্রশ্ন করলো।

"হুম। আহা, এতো সিঙ্গাড়া নয়, এ হচ্ছে অমৃত।"

"তাহলে বিলটা তুই দে।"

মুন্না মুখটা হাসি হাসি করে মোস্তাকের দিকে নিয়ে গেলো। ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে শান্তভাবে বললো, "বিল তোর ইয়ের মধ্যে দিবো শালা। এক পয়সা লাভ করতে পারলাম না আর তোদের মতো গাব্বরদের খাওয়াই, না? তোদের ওটা পেট না দরিয়া? হোটেলের সব সিঙ্গাড়া খেয়ে শেষ করে ফেলেছিস। তাও তো এই জঘন্য, পচা সিঙ্গাড়া। আমি তো ভেবে পাই না একটু

ভালো জিনিস পেলে তোরা কি করতিস। মনে হয় হোটেল সুদ্ধ খেয়ে ফেলতিস। হ্যাঁ, সেটাই করতিস তোরা। তোদের ঐ পেটে আস্ত জাহাজ ঢুকে যায় আর এ তো একটা হোটেল।"

বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়েই দিলো দৌড়। এক দৌড়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেলো সে। মুন্নার এই কাজটা নিতান্ত কাপুরুষোচিত বলে আমার মনে হলো। তার এরকম করা নিশ্চয় উচিত হয়নি। আরে সে বিল দিতে না চাইলে কেউ কি জোর করে দেয়াতো? ওর এমন আচরণে আমি মর্মাহত হলাম। আমি মোস্তাকদের বললাম যে বিল আমরা মুন্নাকে দিয়েই দেয়াবো, সেটাই হবে তার আচরণের উপযুক্ত শাস্তি।

"তোরা দাঁড়া, আমি মুন্নাকে ধরে নিয়ে আসি।" আমি ওদেরকে বলাম। "ওর এমন আচরণ কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বিল ওকেই দিতে হবে।"

বলে আমি হোটেল থেকে বের হয়ে পড়লাম। মুন্না হাল ছাড়েনি। হোটেলের পাশেই শেয়ার হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। দেখে আমি বললাম, "হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে..."

মুন্না বললো যে হাল ছাড়তে সে শেখেনি, সেটা তার স্বভাবে নেই। নৌকা ডুবে গেলেও হাল সে ঠিকই ধরে রাখবে, হালটা যদি তাকে টেনে তলায় নিয়ে যায় তাও। বলেই সে জোরে কণ্ঠ ছেড়ে দিলো, "সেল সেল টাইকো সেল..."

আমি বললাম এখানে আজ আর বসে থাকার মানে হয় না। আমাদের উচিত বাসায় ফিরে যাওয়া আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে আগামীকালের লাভের হিসাব করা। মুন্না বললো যে বুদ্ধিটা ভালো। অতএব আমরা বাসার দিকে রওনা দিলাম।

পরদিন স্টক এক্সচেঞ্জে টাইকোর দাম আবারো তিনটাকা বেড়ে পঁয়ষট্টি টাকা হলো। কিন্তু কার্ব মার্কেটে দাম এক পয়সাও বাড়লো না। সেদিনও কেউ আমাদের ষাট টাকার বেশি দাম বললো না। তখন আমাদের কেমন যেনো মনে হতে লাগলো। আমাদের অস্থির লাগতে শুরু করলো। আমাদের মনে হলো শেয়ারটা আমাদের বুকের উপর বোঝার মতো চেপে বসেছে। সিন্দাবাদের ভূতের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে সে নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি করে যাচ্ছে। সেটা থেকে আমাদের লাভ হচ্ছে না কিছু অথচ সেটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে গিয়ে আমাদের সময় আর শক্তি নষ্ট হচ্ছে।

মাঝে একবার আমরা অন্য পথ ধরেছিলাম। কোনো শৈল্পিক উপায়ে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করেছিলাম। আমরা কয়েকজন রাস্তার উপর গোল হয়ে বসেছিলাম আর মুন্না হাতে তালি দিয়ে গান ধরেছিলো-

'সেল সেল সেল পানির দরে সেল... গেলো গেলো গেলো পানির দরে গেলো... সেল সেল সেল...'

মুন্নার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হাতে তালি দিয়ে গেলাম। আমাদের শৈল্পিক প্রচেষ্টা একেবারে বৃথা গেলো সেটা আমি বলবো না। একজন শিল্প রসিক ক্রেতা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসে বললো, "পানির দরটা কতো ভাই?"

"পঁয়ষট্টি।" মুন্না উত্তর দিলো।

"ও বাবা। মরুভূমিতেও এতো দামে পানি বিক্রি হয় না।"

"এটা মরুভূমি না। হাশরের ময়দান। মাথার দুহাত উপরে সূর্য, গনগনে আগুনের হলকা চারদিকে, কোথাও পানি নেই..."

"বাপরে, তাহলে তো পানির দামটা আরো বেশি হওয়া দরকার।"

"হ্যাঁ আমরাও তো সেটাই বলি। হাশরের ময়দানে পঁয়ষট্টি টাকায় পানি পাওয়ার আশা করাটা হাস্যকর। দেন সত্তর টাকা দেন।"

লোকটা বললো যে এটা সত্যি হাশরের ময়দান কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়, তবে যে জিনিস পঁয়ষট্টি টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা সত্তর টাকা দিয়ে কিনলে নিশ্চিতভাবেই এটা তার কাছে হাশরের ময়দান হয়ে যাবে। নিরাপদ থাকার জন্য সে বরং শেয়ারটা কিনবেই না।

লোকটা চলে যেতে আমরা ঘৃণাভরে শেয়ারটার দিকে চেয়ে রইলাম। মুন্না বিড় বিড় করে বললো, "এ শেয়ারটা কিনেই পাপ করেছি দেখছি, অ্যাঁ!"

মুন্নার কথাটা সত্যি বলে আমার মনে হলো। আমারও মনে হচ্ছিলো এ শেয়ারটা নিয়ে আমরা প্যাঁচে পড়ে গেছি। আমি মুন্নাকে বললাম কি কাণ্ড ঘটেছে। রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি কি যেনো একটা জিনিস আমার গলায় চেপে বসেছে আর আমাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। মুন্না বললো আশ্চর্য কাণ্ড, সেও একই রকম স্বপ্ন দেখেছে। তবে তার স্বপ্নটা আরেকটু ভয়াবহ ছিলো। সে স্বপ্ন দেখেছে একটা অদ্ভুত জিনিস জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে কাছে গেলেই জিনিসটা তাকে ধাক্কা দিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিবে। মুন্না কিছুতেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে যেতে চাইছিলো না, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো পালিয়ে যেতে কিন্তু যতো সে উল্টোদিকে দৌড়াচ্ছিলো ততোই অগ্নিকুণ্ডের কাছে চলে যাচ্ছিলো। অগ্নিকুণ্ডের একদম কাছাকাছি হতে আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙে যায় ফলে এ যাত্রা সে আগুনে পুড়ে মরার হাত থেকে রক্ষা পায়। মুন্নার স্বপ্ন শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমরা নিঃসন্দেহ হলাম যে সেই অদ্ভুত জিনিসটা হচ্ছে একটা শয়তান যে এই শেয়ারটার মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে। শয়তানটা এখন আমাদের ঘাড়ের

উপর চেপে বসে লাফাচ্ছে আর আমাদের লেজে-গোবরে অবস্থা দেখে দাঁত বের করে হাসছে। ধীরে ধীরে সে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। এভাবে একসময় সে আমাদের দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে মেরে ফেলবে আর তারপর আমাদের টেনে নরকে নিয়ে যাবে। এর হাত থেকে মুক্তির উপায় আমাদের জানা নেই। এ যেনো রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সেই বোতল শয়তানের মতো, যার হাত থেকে মুক্তির উপায় নেই। বোতলটা তার মালিককে কখনই ছেড়ে যাবে না এবং মৃত্যুর পর মালিককে টেনে নরকে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এ শেয়ারটাও তাই। এখন আমরা এটার মালিক আর এটা কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যাবে না। এটা আমাদের গলা টিপে মেরে ফেলবে আর তারপর আমাদের নরকেই টেনে নিবে।

"বুঝলি, এ বড় সাংঘাতিক শেয়ার।" মুন্না বললো। "আমাদের এ শেয়ারটা ছেড়ে দিতে হবে আর প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হবে।"

আবার শুরু করার বিষয়টা পরে, কিন্তু শেয়ারটা যে ছেড়ে দিতে হবে এ ব্যাপারে আমি মুন্নার সাথে একমত হলাম। এ শয়তানকে ঘাড় থেকে নামাতেই হবে, না হলে আমাদের মুক্তি নেই। রবার্ট লুই স্টিভেনসনের বোতল শয়তান থেকে মুক্তির একটাই উপায় ছিলো, বোতল বন্দী শয়তানকে কেনা দামের চাইতে কমে বিক্রি করা। হ্যাঁ আমাদেরও তাই করতে হবে। কেনা দামের চাইতে কমে আমাদের শেয়ার বিক্রি করে দিতে হবে। মুক্তির এ হচ্ছে একমাত্র পথ।

"কমে ছেড়ে দিতে বলছিস?" মুন্না প্রশ্ন করলো। "তিনদিন ধরে এ তামশাটা নিয়ে ঘুরছি। লাভ হলেও এমন আহামরি কিছু তো হবে না। পঁয়ষট্টি টাকায় বিক্রি করলে লাভ হবে মোটে তিনশো টাকা। তিনদিনে আমাদের খরচই হলো তার চাইতে বেশি। অথচ আমরা যা করেছি তাতে লোকে ভাববে তিন লাখ টাকা লাভ বুঝি। এখন কেনা দামের চাইতে কমে বিক্রি করে দিতে বলছিস?"

আমি ভারিক্কি চালে বললাম, "ঘাড় থেকে শয়তান নামানোর ওটা হচ্ছে একমাত্র পথ।"

"ঠিক বলেছিস। যাহ শালা চল, কমেই বিক্রি করে দেই। এ যন্ত্রণাটা আগে ঘাড় থেকে নামুক।"

এভাবে আমরা দুজনেই আমাদের শেয়ার কেনা দামের চাইতে কমে ছেড়ে দিতে রাজি হলাম। আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সেটা বিক্রি হয়ে গেলো।

"যাক, আপদ গেছে।" ষাট টাকায় শেয়ারটা বিক্রি করে দিয়ে মুন্না হাত ঝাড়া দিতে দিতে বললো। "তিনশো টাকা লাভের আশায় তিনদিন ধরে ঘুরে

শেষ পর্যন্ত দুশো টাকা লস দিলাম। আমার যদি কখনো জীবনী লেখা হয় তবে এই ব্যাপারটা আমি সবার আগে বলবো।"

বলে মুন্না বিলাপ শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা হকচকিয়ে গেলাম। আমার ধারণা ছিলো শেয়ারটাই হচ্ছে শয়তান, সেই ষড়যন্ত্র করে বিক্রি হবে না বলে ঠিক করেছিলো। কিন্তু মুন্নার বিলাপ শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে তার কপালটাই হচ্ছে যতো গণ্ডগোলের মূল। তার বিলাপ শুনে বোঝা গেলো যে তার কপাল হচ্ছে ফাটা আর সব হচ্ছে তার ফাটা কপালের দোষ। শয়তান ফয়তান আসলে কিছু না, আসল সমস্যা হচ্ছে মুন্নার কপাল। মুন্না হাতের তালু দিয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে নিজের ফাটা কপালকে অভিশাপ দিয়ে গেলো। পারিপার্শ্বিক ভুলে সে বেশ উচ্চস্বরে বিলাপ করছিলো, ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা একটা দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। লোকজন ভিড় করে তার বিলাপ দেখতে লাগলো। ভিড়ের মধ্যে এক ছোকড়া তার সঙ্গীকে ডেকে বললো, "এই এখানে এক পাগল শোকের গান করছে রে, দেখবি তো ছুটে আয়।"

মোস্তাক মুন্নার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললো, "খুব জমেছে রে। থেমে যাসনে, চালিয়ে যা।"

তখন মুন্না মুখ তুলে দেখলো কি অবস্থা। সে তার চারপাশে একদল মানুষকে ভিড় করে খিক খিক করে হাসতে দেখলো। অবস্থাটা তার জন্য হয়ে দাঁড়ালো অসম্মানজনক। সে ভিড় ঠেলে বের হয়ে হিড় হিড় করে হাঁটা শুরু করলো। বাধ্য হয়ে আমাকে তার পিছে পিছে যেতে হলো।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের সামনে চলে এলাম। সেখানে এসে আমাদের মনে হলো, শেয়ার ব্যবসা করতে এসে স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনের ভিতরে না ঢোকা অন্যায়। আসল ব্যবসা হয় ওখান থেকেই। স্টক এক্সচেঞ্জের কিছু মেম্বার থাকে, যাদের মাধ্যমে শেয়ার কেনা বেচা হয়। এখন কম সময়ে অনেক লাভ হচ্ছে বলে অনেক মানুষ এসে জড়ো হয়েছে আর সে কারণে কার্ব মার্কেট গড়ে উঠেছে। অল্প পুঁজি নিয়ে এখানে আসলে আর দ্রুত কেনা বেচা করতে চাইলে কার্ব মার্কেটটাই বেশি উপযোগী।

স্টক এক্সচেঞ্জে ঢোকার মুখে লাখো মানুষের ভিড়। ভিড় ঠেলে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। নীচতলায় ট্রেডিং ফ্লোর। অন্য তলাগুলোয় কয়েকটা করে মেম্বারের ঘর, আর ঘরগুলোর সামনে গাদাগাদি মানুষ। ভিড় দেখতে দেখতে আমরা ছয়তলা চলে গেলাম। ছয়তলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুন্না বললো যে সে আবারো স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকবে কিনা তার ঠিক নেই, কিন্তু যেহেতু এই ভবনটার

কল্যাণে কিছু বেকার মানুষ করে টরে খাচ্ছে আর সে নিজেও হয়তো কোনোদিন কিছু একটা করে বসবে, তাই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সে ভবনটাকে কিছু দিয়ে যাবে। আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম সে কি দিবে। উত্তরে সে মুচকি হেসে পাশের টয়লেটে ঢুকে পড়লো। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে মাথাটা বের করে দিয়ে হাতের কনে নখটা দেখিয়ে বললো, "এটা।"

ছয়

আমার মেসের গলির দুই নম্বর বাসাটার তিনতলায় মায়ারা থাকে। ওদের বাসার পরের বাসাটায় আমার মেস। সন্ধ্যার একটু আগে মেসে ফেরার মুখে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনতলার বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে মায়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৃশ্যটা সুন্দর লাগছিলো। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলোয় একাকী এক মেয়ের বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে অপার্থিব সৌন্দর্য রয়েছে। আমি দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু বেশিক্ষণ দৃশ্যটা আমি দেখতে পেলাম না। মায়া অন্যদিকে চেয়ে ছিলো। মুখ ঘুড়িয়ে আমাকে দেখতে পেলো। আমার সাথে চোখাচোখি হতে সে ইশারায় আমাকে দাঁড়াতে বলে ভিতরে চলে গেলো। আমি ওদের বাসার সদর দরজা টপকে ভিতরের ছোট গলির মধ্যে ওর অপেক্ষায় দাঁড়ালাম।

মায়ার সাথে আমার পরিচয়ের গল্পটা বলি। তখন আমি এই মেসটায় নতুন এসেছি। একদিন সন্ধ্যার পর মেসে ঢুকতে গিয়ে পোলাউয়ের গন্ধ পেয়ে থমকে গেলাম। রাত্রে কোনো ভোজ আছে মনে করে ভিতরে ঢুকে দেখি পোলাউ টোলাউ কিছু না, মেসের খাবারের মেনু হচ্ছে ভাত আর রুই মাছ। রুই মাছটা বোধহয় পচা ছিলো, কেমন বিচ্ছিরি গন্ধ ছেড়েছে। জানালা দিয়ে ভুরভুর করে উড়ে আসা পোলাউয়ের গন্ধ শুকতে শুকতে পচা রুই খেতে হবে ভাবতে আমার কেমন যেনো লাগলো। আমি মেস থেকে বের হয়ে গন্ধ শুকে শুকে পাশের বাসার তিনতলায় গিয়ে হাজির হলাম। বেল টিপতে সুন্দর এক তরুণী দরজা খুলে দাঁড়ালো। অপ্রত্যাশিত আমাকে দেখে সুন্দর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "কাকে

চাচ্ছেন?"

আমি বললাম যে আমি কাউকে চাচ্ছি না, কিন্তু একটা পোলাউয়ের গন্ধ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে। পোলাউয়ের গন্ধটা আশ্চর্য সুন্দর; এতো সুন্দর যে সেটা আমাকে এ পর্যন্ত আসতে বাধ্য করেছে আর আমার ধারণা পোলাউটা এ বাসাতেই হচ্ছে। তাদের যদি আপত্তি না থাকে তবে পোলাউটার রেসিপি আমি পেতে আগ্রহী। আমার কথা শুনে মেয়েটি বললো যে তার ধারণা রেসিপিটা হচ্ছে ভান, আসলে আমি কোনো বদ মতলব নিয়ে হাজির হয়েছি। মেয়েটির কথা শুনে তার ছোট বোন আর মা এসে হাজির হলেন। এসেই তারা জানতে চাইলেন আমার আসল মতলবটা কি। যখন আমি তাদের বোঝাতে পারলাম যে অন্য কোনো মতলব নয়, তবে পোলাউয়ের রেসিপির জন্য না হলেও পোলাউয়ের গন্ধ শুকে আমি হাজির হয়েছি, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

সেদিন যে মেয়েটি দরজা খুলে আমার সাথে কথা বলেছিলো সেই হচ্ছে মায়া। আমি গলির মধ্যে ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একটুপর সে নীচে নেমে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, "আপনাকে খুঁজছিলাম।"

আমি সুন্দর মুখটার দিয়ে চেয়ে প্রশ্ন করলাম, "কেনো? কি ব্যাপার? খোঁজাখুঁজির মতো কি করেছি আমি?"

"আপনি তো পোলাউ খেতে ভালোবাসেন। কালকে আমাদের বাসায় আপনার পোলাউ খাওয়ার দাওয়াত।"

"পোলাউ কেনো? কেউ কি শেয়ার ব্যবসায় লাভ করেছে?"

মায়া বিস্মিত হয়ে বললো, "আপনার কথার মানে বুঝেছি বলে মনে হয় না। শেয়ার ব্যবসায় লাভ করেছে মানে কি?"

আমি বললাম যে এখন হচ্ছে শেয়ার ব্যবসার সময়। চারদিকে সবাই ব্যবসা করে বেড়াচ্ছে আর লাভ করে অন্যদের পোলাউ কোর্মা খাওয়াচ্ছে।

"আপনিও ব্যবসা করছেন নাকি?" মায়া প্রশ্ন করলো। "কতো লাভ করলেন?"

"লাভ? না লাভ করতে পারিনি। তবে সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছিলাম। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।"

"সে কেমন?"

"একটা শেয়ার আমি কিনেছিলাম বটে, আমি আর আমার এক বন্ধু মিলে। তবে আমরা জানতাম না যে শেয়ারটার মধ্যে একটা শয়তান ঘাপটি মেরে বসে আছে। কেনার পরেই শয়তানটা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসলো। সে মতলব করেছিলো আমাদের ঘাড় ভেঙে আমাদের রক্ত চুষে খাওয়ার, কিন্তু সেটা টের

পেয়ে যাওয়ায় আমরা সেটাকে বিক্রি করে দিতে চাইলাম। বিক্রি করতে গিয়ে দেখলাম কিছুতেই সে বিক্রি হবে না। সেটাকে আমরা যতই বিক্রি করতে যাই সে আমাদের ঘাড়ে ততো শক্ত করে চেপে বসে আর রাত্রে আমাদের দুঃস্বপ্নে হানা দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাদের হৃদযন্ত্র বিকল করে দিয়ে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে। মেরে ফেললেই সে আমাদের নরকে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা হচ্ছি শক্ত হৃৎপিণ্ডের মানুষ। আমরা ঠিক করলাম এতো সহজে আমরা শেয়ার শয়তানের কাছে হার মানবো না আর আমাদের নরকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও তার সফল হতে দিবো না।"

মায়া ভুরু কুঁচকে বিস্মিত মুখে আমার দিকে চেয়ে ছিলো। তার বিস্মিত হওয়ারই কথা। এমন রোমহর্ষক কাহিনী শুনলে বিস্ময় তো হবেই। আমি বলে চললাম, "হ্যাঁ, শেয়ারের মধ্যে বসে থাকা শয়তানটার বদ পরিকল্পনা টের পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা ঠিক করলাম যে করেই হোক এটাকে বিক্রি করে দিয়ে এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু বিক্রি সে কিছুতেই হবে না। তখন আমাদের মনে পড়লো যে শয়তানের হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কেনা দামের চাইতে কমে তাকে বিক্রি করে দেয়া। মনে পড়ার সাথে সাথে আমরা কেনা দামের দাইতে কমে সেটাকে বিক্রি করতে গেলাম। আর দেখতেই পাচ্ছ, সেটা আমাদের ঘাড় ভাঙতে পারেনি।"

"তার মানে হচ্ছে আপনারা ব্যবসায় লস করেছেন।"

"আহা তুমি শুধু লসটাই দেখলে! আমরা যে একটা শয়তানের কতো বড় পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিলাম সেটা তোমার চোখে পড়লো না।"

"সে তো বটেই। লস তো আপনাদের দিতেই হতো। লস না দিলেই তো শয়তানটা আপনাদের টেনে নরকে নিয়ে যেতো।"

"হ্যাঁ, বজ্জাতটা সেরকমই পরিকল্পনা করেছিলো।"

"তাহলে ঠিকই আছে।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "অবশ্য ব্যাপারটা শয়তানের ষড়যন্ত্র নাও হতে পারে। মুন্না, মানে আমার সেই বন্ধু বলছিলো যে আসল ব্যাপার হচ্ছে ওর কপাল। ওর কপাল হচ্ছে ফাটা আর সেই ফাটা কপালটাই আসলে ষড়যন্ত্রটা করেছিলো।"

"নাকি কপালের ফাটা দিয়ে শয়তানটা ঢুকে পড়েছিলো?"

মায়ার কথা শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। এরকম ভাবে তো ভেবে দেখিনি! সত্যি তো, ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে। এরকম একটা চমৎকার তথ্য দেয়ার জন্য মায়াকে আমি বাহবা দিলাম। সে হেসে আমার বাহবা গ্রহণ করলো।

তারপর বললো, "আচ্ছা আমি এখন যাই। কাল রাত্রে আমাদের বাসায় দাওয়াত, মনে থাকে যেনো।"

বলে সে চলে গেলো। ওর আচরণে আমি একটু মনঃক্ষুণ্ন হলাম। এতো বড় একটা বিপদ থেকে আমি উদ্ধার পেলাম আর সে তেমন কোনো সহানুভূতি দেখালো না? অথচ আমি... নাহ... দূর...

আমি আর মেসে ফিরলাম না। সন্ধ্যা নেমে আসছে। বছরের এই সময়টায় বিকেলের দৈর্ঘ্য হয় খুব কম। হেমন্তের বিকেলের আশ্চর্য আলো দেখতে দেখতে হঠাৎ ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। আমি একবার মুখ তুলে মায়াদের বাসার দিকে তাকাই। সে এখন আর বারান্দায় নেই। কালকে রাত্রে ওদের বাসায় দাওয়াত। কেনো দাওয়াত, কিসের জন্য কে জানে। হঠাৎ মাঝখানের সময়টাকে বড় দীর্ঘ বলে মনে হলো। একটা দীর্ঘ রাত আর দীর্ঘ দিনের পর আবার ওর সাথে দেখা হবে।

হাঁটতে হাঁটতে মালিবাগ মোড়ে চলে এলাম। ফুটপাতে হকাররা পত্রিকার পসরা সাজিয়ে বসেছে। সব পত্রিকার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে শেয়ার বাজার। সব পত্রিকার প্রচ্ছদে কার্ব মার্কেটের ছবি। এমনকি যেসব পত্রিকার দিকে লোকে সরাসরি তাকায় না, একটু ট্যারা চোখে তাকায় সেগুলোও কি করে যেনো নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কের সাথে শেয়ার ব্যবসাকে গুলিয়ে ফেলে গপ্প ফেঁদেছে। উন্মাদ পত্রিকাও শেয়ার বাজার নিয়ে ফিচার করেছে। তাদের কাল্পনিক প্রতিনিধি শেয়ার বাজার পরিদর্শনে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে। কার্ব মার্কেটের এক জায়গায় সে দেখলো এক লোক হাতে অনেকগুলো মুরগী নিয়ে সেল সেল বলে চিল্লাচ্ছে। প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করলো- "সেল যে করছেন, ডিভিডেন্ড দিবেন কেমনে?"

"কি কন ডিভিডেন্ড দিবো কেমনে?" মুরগী বিক্রেতা উত্তর দিলো। "ডিম পাড়ন্যা মুরগী, প্রতিদিন চার টাকা হারে ডিভিডেন্ড দিবে।"

ফিচারটা পড়তে পড়তে হাসছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে আমার কাঁধে কেউ থাবা দিয়ে বললো, "ঐ পাগল, একা একা হাসিস কেনো?"

আমি তাকিয়ে শওকত আর মুন্নাকে দেখতে পেলাম। শওকত আমাদের আরেক বন্ধু। সে ধমক দিয়ে বললো, "পত্রিকা রাখ বেটা।"

আমি পত্রিকা রেখে ঘটনা কি জানতে চাইলাম।

"হে হে, এখন আর আমাদের কাজ কি?" মুন্না হাসতে হাসতে বললো, "এখন কাজ একটাই, শেয়ার ব্যবসা। শওকতের কাছে একশো শাইনপুকুর ছিলো। মগবাজারে গিয়ে বিক্রি করে এলাম।"

"মগবাজারেও স্টক এক্সচেঞ্জ খুলে ফেলেছে?" আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"আরে না।" শওকত উত্তর দিলো। "আমার পরিচিত একজন কিনলো। তার বাসায় গিয়ে দিয়ে এলাম।"

"ও আচ্ছা।"

"ওর কতো লাভ হলো বল তো?" মুন্না প্রশ্ন করলো।

"কতো?"

"বেয়াল্লিশ হাজার বেটা, বেয়াল্লিশ হাজার। দেখ সবাই কেমন ব্যবসা করছে। শুধু তুই আমি দুই লেতুর লস দিয়েছি। গোটা ঢাকা শহর খুঁজে তুই আমাদের মতো আর একজন লেতুর খুঁজে পাবি না যে এই বাজারে লস দিয়েছে। হো হো হো..."

মুন্না রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুলে দুলে হো হো করে হাসতে লাগলো, যেনো ব্যবসায় লস দেয়া খুব মজার একটা ব্যাপার।

"এ বেটা পুরা পাগল হয়ে গেছে।" শওকত বললো। "তখন থেকে একটানা বেয়াল্লিশ বার এই কথা বলেছে আর বাইশশো বার হো হো করে হেসেছে।"

মুন্না হো হো করে হাসতে হাসতেই বললো, "তুই আমাদের মতো অবস্থায় পড়লে দেখতাম তুই কি করিস, হো হো হো হো হো..."

"আমি তোদের মতো অবস্থায় পড়তে যাবো কেনো? আমি তোদের মতো এমন তাড়াহুড়ো করে বিক্রি করে দিতাম নাকি? আরে বাবা তোরা কি দিন এনে দিন খাস? বিক্রি না করলে কি তোদের খাবার জুটছিলো না? কটা দিন ধরে রাখতে পারলি না? ধরে রাখলে ঠিকই দাম বাড়তো। আর অপেক্ষা করতে যদি নাই পারিস তবে কোনো মেম্বারের মাধ্যমে তো বিক্রি করে দিতে পারতিস। ভিতরে তো দাম বেশিই ছিলো।"

"কিন্তু শেয়ারটার মধ্যে একটা শয়তান..." আমি বলতে শুরু করলাম।

"রাখ তোর শয়তান।" শওকত ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিলো। "তোদের এই শয়তানের গল্প শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যাবো।"

"তুই জানিস না শয়তানটা কি ভয়ানক ছিলো।" আমি বলে চললাম। "সে মুন্নার ফাটা কপাল দিয়ে ঢুকে পড়েছিলো আর আরেকটু হলেই সে আমাদের খামচে দিতো।"

"মানে? এতক্ষণ তো শুনলাম সে তোদের নরকে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিলো। খামচে দিতে চাইলো কখন?"

"আরে এমনি তো আর নরকে নিয়ে যেতে পারে না। নরকে নিতে হলে প্রথমে মেরে ফেলতে হয়। সে যখন রাতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়েও আমাদের মেরে ফেলতে পারলো না তখন সে খামচে দেয়ার প্ল্যান করেছিলো।"

শওকত তখন করলো কি, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুম করে আমাকে খামচে দিলো। আমি চমকে লাফিয়ে উঠলাম। শওকতের হাসি রোগ আছে। একটুতেই সে হাসতে হাসতে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। খামচি দিয়েই সে হাসতে হাসতে বসে পড়লো। হু হু করে হাসতে হাসতে বললো, "দিলাম খামচি। এখন?"

শওকতের আচরণটা আমার কাছে নিতান্ত ছেলেমানুষি আচরণ বলে মনে হলো। আমি গম্ভীরভাবে বললাম যে এমনি করে যুগে যুগে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। শুনে শওকত পেট চেপে ধরে হাসতে হাসতে লাফাতে লাগলো।

"ওরে, কি আমার গুরুত্বপূর্ণ কথা রে। উরে বাবা হি হি হি..."

মুন্না আমার দিকে চেয়ে বললো, "থাক বাদ দে। পাগল খেপাস না। চল, আমাদের অন্য প্ল্যান আছে।"

"কি প্ল্যান?"

"আরে শওকত বেয়াল্লিশ হাজার টাকা লাভ করলো আর আমরা কি এমনি এমনি ছেড়ে দিবো নাকি? চল এখন গিয়ে আমরা ওর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবো।"

কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার জন্য শওকতের মাথাটা উপযুক্ত জায়গা বলে আমার মনে হলো না। ওর মাথায় বড় বড় চুল আর সেগুলো খাওয়ার মতো না বলেই আমার ধারণা। এরকম মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেলে কাঁঠালের সাথে চুল খেতেই হবে। আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম যে এরকম নোংরা মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে আমার আপত্তি আছে। তবে শওকত যদি মাথা নেড়া করতে রাজি হয় তাহলে আমি ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

"হ্যাঁ, তোর বিবেচনার জন্য আমি মাথা নেড়া করি আর কি।" শওকত বললো। "ইচ্ছে হলে তুই এই মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারিস, না হলে ফুটে যেতে পারিস। তাতে ভালোই হবে, একজন কমবে।"

বলে শওকত একজন কমে যাবার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে হাসতে লাগলো। কাউকে খুশি হওয়ার কোনো সুযোগ আমি কখনো দিতে চাই না। সেটা আমার ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমি বললাম যে শওকত খুশি হয় এমন কোনো কাজ আমি কখনো করবো না। তাকে অখুশি করার জন্য দরকার হলে আমি ওর ঐ

মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙে খাবো।

মালিবাগ মোড়ের কাছেই শওকতের বাসা। আমরা ওর বাসায় এসে হাজির হলাম। সেখানে শওকতের বন্ধু ওবায়েদ আর আমাদের আরেক বন্ধু আলম আগে থেকেই হাজির ছিলো। ওবায়েদ ইতিমধ্যে শেয়ার ব্যবসায় কয়েক লাখ টাকা লাভ করেছে এবং শেয়ার ব্যবসার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নাম কুড়িয়েছে। শওকতের ঘরে বসে ওবায়েদ শেয়ার বাজার সম্পর্কে তার যতো জ্ঞান সেগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলো। সে বললো যে খুলনা বগুড়া সিলেট এরকম অনেক জায়গায় নতুন স্টক এক্সচেঞ্জ তৈরি হচ্ছে আর সে খুলনা স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার হয়ে চলে যাচ্ছে। দু'লাখ টাকা দিয়ে সে খুলনা স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারশিপ কিনে নিয়েছে।

শুনে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মুন্না। আমরা দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় সারি বেধে বসে ছিলাম। মুন্না ছিলো চেয়ারে। উত্তেজিত হয়ে সে বিছানায় লাফিয়ে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললো, "দেখ শালা দেখ, সবার অবস্থা দেখ। সবাই কোথায় চলে যাচ্ছে আর আমরা? লাথি দে লাথি দে..."

বলতে বলতে সে উল্টোদিকে ঘুরে নিতম্বটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। আর তারপরই উঁক করে একটা শব্দ করে হুড়মুড় করে বিছানায় উল্টে পড়লো।

"কোন শালা লাথি দিলো রে?" উল্টানো অবস্থা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়ল মুন্না।

"আমি না।" আমি বললাম। "ঐ ওবায়েদ।"

ওবায়েদ তখন হু হু করে হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলো। মুন্না তার দিকে কড়া চোখে চাইতে সে বালিশে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

মুন্না রেগে গিয়ে বললো, "তোর মতো উজবুক মাথা মোটা মানুষ পৃথিবীতে কেনো জন্মায়? খুলনার মতো বাজে জায়গার স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার হওয়া ছাড়া তোদের দ্বারা আর কোন কাজটা হয়?"

শুনে ওবায়েদের হাসি আরো বেড়ে গেলো। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বিছানা থেকে অর্ধেক পড়ে গিয়ে ঝুলতে লাগলো সে।

শওকতের বাবা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা সবাই শেয়ার ব্যবসা করছ নাকি?"

আমাদের মধ্যে একমাত্র আলমই এখনো শেয়ার ব্যবসায় নামেনি। আমরা চাচাকে সে কথা জানালাম। তিনি তখন মুন্নার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "ওবায়েদের অবস্থা তো জানি। তোমাদের ব্যবসা কেমন হচ্ছে?"

মুন্না হে হে করে হাসতে হাসতে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, "আমরা একদম সূত্র মেনে ব্যবসা করছি।"

"সূত্র মেনে ব্যবসা? সেটা কি?"

"সূত্র বলে যে ব্যবসা শুরু করতে হয় ছোট করে। আস্তে আস্তে সেটা বড় হবে। আমরা ছোট করেই শুরু করেছি। আবার ব্যবসার প্রথমদিকে ছোটখাটো লস দিয়ে অভিজ্ঞতা পোক্ত করতে হয়। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাও পোক্ত করেছি।"

চাচা খুক খুক করে হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "ছোটখাটো লস দাও সমস্যা নাই। কিন্তু বড় লস দিয়ে পথে বসে যেও না। যা করবে বুঝে শুনে করো। আমার তো মনে হয় না শেয়ার বাজারের এইরকম অবস্থা বেশিদিন টিকবে।"

মুন্না আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করলো, "কেনো চাচা?"

"যা হচ্ছে তা কি তোমাদের স্বাভাবিক মনে হচ্ছে নাকি? কোথাকার কোন শেয়ার বাজারে প্রতিদিন সব শেয়ারের দাম বাড়ে? অনেক শেয়ারের দাম আবার দিনে তিনশো চারশো টাকা করে বাড়ে। এইরকম অবস্থা কি স্বাভাবিক? দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো না, ব্যাংকগুলোর কাছে টাকা নেই, অথচ শেয়ার মার্কেটে প্রতিদিন সব কোম্পানির দাম হু হু করে বাড়ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? তিন চার মাস আগে এই শেয়ার বাজারে দিনে এক কোটি টাকার কেনা বেচা হতো না, অথচ এখন প্রতিদিন একশো কোটি টাকার বেচা কেনা হচ্ছে। কেনো, হঠাৎ করে ওরা আলাদীনের চেরাগ পেয়ে গেলো নাকি? এটা হচ্ছে কি করে?"

চাচা থেমে ঘুরে ঘুরে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন। আমরা কেউ কোনো উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন, "স্বাভাবিক অবস্থায় এরকম হওয়া সম্ভব না। এমন হচ্ছে কারণ ইচ্ছে করে এমন করানো হচ্ছে। কিছু মানুষকে অস্বাভাবিক লাভ করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য বাজার এমন করা হয়েছে। এইগুলা সরকারের নিয়ন্ত্রণ করার কথা, কিন্তু সরকার কিছু করছে না। কারণ সরকার নিজেই এই লাভ করার সুযোগটা দিচ্ছে। আর সে জন্য আমাদের অর্থমন্ত্রী উল্টাপাল্টা কথা বলে বেড়াচ্ছে। বলছে কিছু ফটকাবাজ মানুষ ব্যবসার কিছু না বুঝে লাফ দিয়ে পড়েছে বলে এমন হচ্ছে।"

মুন্না খুক খুক করে হেসে বললো, "অর্থমন্ত্রী এই কথাটা বোধহয় ঠিক বলেছে। আমরা তো ব্যবসার কিছু বুঝি না।"

চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই হচ্ছে তোমাদের সমস্যা, কোনো কিছু

তলিয়ে দেখতে জানো না, দেখো শুধু উপর উপর। তোমার কি ধারণা তোমরা ব্যবসা করতে গেছো বলে শেয়ার বাজারের এ অবস্থা হয়েছে? তোমরা কয়দিন হলো ব্যবসা করতে গেছো? তোমরা কি ঐ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছো? দেখো, বাজার প্রথমে লাফ দেয়া শুরু করেছে তারপর কিন্তু তোমরা ওখানে ব্যবসা করতে গেছো। এই যে এখন হাজার হাজার মানুষ কার্ব মার্কেটে ব্যবসা করে, এই কার্ব মার্কেট তো কখনো ছিলো না। শেয়ারের দাম প্রতিদিন বাড়ছে, এখানে আসলেই লাভ করা যাচ্ছে এই দেখেই না মানুষ এসে কার্ব মার্কেট গড়ে তুলেছে। লাভ করতে পারলে মানুষ আসবে না কেনো? কিন্তু এই মানুষগুলা আসার আগে বাজার যে লাফ দেয়া শুরু করলো সেটা কারা করলো? সেটা করেছে সরকারের মনোনীত লোকেরা। এমনি এমনি বাজারের অবস্থা এরকম হয়নি, এটা একটা পরিকল্পনার ফসল। এই পরিকল্পনা কিন্তু সরকারের একদম উপরের লেভেল থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি মনে করে সরকার এ সম্পর্কে কিছু জানে না, তাহলে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করে। সরকার নিজেই এর সঙ্গে জড়িত কারণ লাভের বিরাট অংশ তাদের পকেটে যাবে। এই যে তোমরা এখন ব্যবসা করতে নেমেছো, এরকম আরো লাখ লাখ লোক চলে আসবে। যখন এরা অল্প কিছু লাভ করবে, তখন আরো লাভের আশায় সর্বস্ব বিনিয়োগ করবে। অন্যদিকে আসলে যাদের লাভের জন্য এই কৃত্রিমভাবে শেয়ার বাজার টেনে তোলা হয়েছে, যখন তারা মনে করবে তাদের যথেষ্ট লাভ হয়েছে, তখন তারা তাদের মূলধন আর লাভ নিয়ে চলে যাবে। সব শেয়ারের দাম তখন পড়ে যাবে। সর্বস্ব বিক্রি করে আসা লোকগুলো তখন পথে বসবে। এই কার্ব মার্কেটে হাজার হাজার মানুষ চোখের পানি ফেলবে দেখো।"

চাচা থামলেন। আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলাম। ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এলো। চাচা কিছুক্ষণ পর কাজের ছেলেটাকে ডেকে আমাদের চা দিতে বলে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে শওকতের বড় ভাই ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে ওবায়েদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "ওবায়েদ, তোমার কি মনে হয় না বেক্সিমকো ফার্মা দু' হাজারে যাবে?"

"হ্যাঁ যাবে।" ওবায়েদ উত্তর দিলো। ঐদিন স্টক এক্সচেঞ্জে ফার্মার দাম ছিলো চারশো বারো টাকা।

"তাহলে তুমি এক কাজ করো, কালকে আমার জন্য পাঁচ হাজার ফার্মার অর্ডার দিয়ে দাও।"

"আচ্ছা।"

চাচা আমাদের মধ্যে যে গুমোট পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন শওকতের বড়

ভাই সেটা কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা তখন কোথায় বসে শওকতের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে বসলাম। শওকত বললো যে সে পুরান ঢাকায় একটা হোটেলের খোঁজ পেয়েছে যেখানকার খাবার একবার খেলে বেহেস্তের খাবারও পানসে বলে মনে হবে।

বেহেস্তে অনন্তকাল থাকতে হবে। অনন্তকাল ধরেই যদি সেখানকার খাবার পানসে মনে হয় তাহলে সমস্যা। আতঙ্কে আমরা কেউ হোটেলটায় খেতে রাজি হলাম না। আমরা সাফ জানিয়ে দিলাম যে এমন কিছু আমরা করতে রাজি নই যাতে করে আমাদের অনন্তকালের সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

শওকত বললো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের খুব বেশি চিন্তা করা উচিত নয় কারণ তার ধারনা সে নিজে ছাড়া আমরা কেউ বেহেস্তে যাবো না। আমরা বললাম মুসলমান হিসেবে বেহেস্তের উপরে আমাদের জন্মগত অধিকার। যে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে জিজ্ঞেস করলেই সে জানিয়ে দিবে যে পৃথিবীর তাবৎ ভদ্র ও ভালোমানুষ বিধর্মীরা নরকে গড়াগড়ি খাবে আর নিতান্ত শয়তান শ্রেণীর মুসলমানরাও বেহেস্তে বসে শরাবন তহুরার বন্যা বইয়ে দিবে।

শওকত বললো যে সে নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলে মনে করে কাজেই এই বিষয়ে সে তর্কে যাবে না, কিন্তু আমরা একটা ভুল করছি।

"আরে বেটা," সে বললো, "কোনো ভালো জিনিসই প্রথমবার চট করে ধরা যায় না সেটা কতো ভালো। বারবার সেই জিনিসটাকে পরীক্ষা করলে তবেই বোঝা যায়। এখানেও প্রথমবার খেলে তোদের ভালো লাগবে বটে, কিন্তু খাবারটা যে কতো ভালো সেটা তোরা প্রথমদিনেই টের পাবি না। তবে হ্যাঁ, পরে যদি আরো খাস তবে রিস্ক থেকে যায়।"

আমরা বললাম এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের আপত্তি নেই। প্রথমবার সেখানে খেয়ে পরে আর হোটেলটার ধারে কাছে না ঘেষলেই আর কোনো সমস্যা নেই।

অতএব আমরা পুরান ঢাকায় যাবার জন্য মালিবাগ মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। কিসে করে পুরান ঢাকায় যাবো সেই নিয়ে আমরা খেঁকালাম কিছুক্ষণ। আলমের মতে আমাদের রিকশা করে যাওয়া উচিত। এতে করে ভাঙাচোরা রাস্তায় রিকশার ঝাঁকুনিতে পেটের খিদেটা বেশ চাগিয়ে উঠবে আর তাতে করে খাওয়াটা হবে বেশ জম্পেশ। শওকতের মত হচ্ছে আলমের পেটের খিদে চাগিয়ে ওঠে এরকম কোনো কিছু আমাদের করা উচিত হবে না, কারণ তাতে করে হোটেলের খাবার কম পড়ে যাবে আর অন্যদের না খেয়ে থাকতে হবে। তাই নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের যাওয়া উচিত বাসে করে।

কিন্তু কোন বাসে আমরা যাবো সেটা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিলো। ছয় নম্বর বাসে করে গেলে গুলিস্থান পর্যন্ত গিয়ে আবার রিকশা নিতে হবে বা হাঁটতে হবে। দশ নম্বর বাস সোজা পুরান ঢাকায় যায় কিন্তু দশ নম্বর বাস একবার কোথাও থামলে আর নড়তে চায় না। সেটা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে আর সেটার হেল্পার বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাত্রীদের ডেকে নিয়ে আসে। যতক্ষণ না সব যাত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাসে ওঠে আর যাত্রীর ভারে বাসটা একদিকে অর্ধেক কাত হয়ে যায় ততক্ষণ সেটা নড়ে না।

সেই মুহূর্তে আমাদের পাশে একটা ছয় নম্বর বাস এসে থামলো। শওকত বললো যে আমরা সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে কোন বাসে যাবো সেটা নিয়ে ঝগড়া করতে পারি অথবা নিজেরা একটা বাস বানিয়ে সেটাতে করে যেতে পারি, তার নিজের মত হচ্ছে সে এই বাসেই চলে যাবে। বলে সে লাফ দিয়ে বাসটায় উঠে পড়লো।

আমরা তাকিয়ে দেখলাম বাসটায় ভিড় নেই, অনেক সিট ফাঁকা পড়ে আছে। এই বাসে উঠে পড়াটা আমাদের কাছেও বুদ্ধিমানের কাজ মনে হলো। কিন্তু বাসটা ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে ফলে বাস ধরার জন্য আমাদের দৌড়তে হলো। আলম তার দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে ভারিক্কি চালে হেঁটে আমাদের পিছনে আসছিলো। সে পকেট থেকে হাত বের করে বাসের পিছনে দৌড়ে নিজের ভারিক্কি চালটা নষ্ট করতে চাইলো না, ফলে তাকে ফেলে রেখেই বাসটা হুশ করে ছুটে গেলো। আমাদের মনে হলো কাজটা ভালো হচ্ছে না, বাস থামিয়ে আলমকে তুলে নেয়া দরকার। তখন বাস থামানোর জন্য শওকত শুরু করলো চিৎকার, মুন্না শুরু করলো তার প্রতিধ্বনি আর ওবায়েদ একটা পা বাসের মেঝেতে ঠুকতে ঠুকতে এক হাত দিয়ে সিটে দমাদম বাড়ি মারতে লাগলো। এতসব কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে আমার ইচ্ছে হলো না। পৃথিবীর যেখানে যখন কোনো প্রাণের স্পন্দন আমি দেখি সেই প্রাণের স্পন্দনে মিশে যেতে আমার ইচ্ছে হয়। কাজেই আমি ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাত নেড়ে ওদের উৎসাহ দিতে লাগলাম।

কিন্তু এতো কাণ্ড করেও বাসটাকে আমরা থামাতে পারলাম না। কি কারণে যেনো রাস্তা প্রায় ফাঁকা আর ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ড্রাইভার বাসটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চললো। আমরা তখনও পিছনে চেয়ে আলমকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখে মুন্না বললো, "এঃ বেটা নবাব কেমন পকেটে হাত ঢুকিয়ে আছে দেখ না। ও বেটা যদি পকেটে হাত ঢুকিয়েই বাসে উঠতে চায় তাহলে বাংলাদেশে কেনো জন্মালো? অন্য

দেশে জন্মালেই পারতো আর অন্য দেশে জন্মে বাংলাদেশের জনসংখ্যা একজন কম হতে অবদান রাখতে পারতো।"

"যা হওয়ার ভালোই হয়েছে।" শওকত বললো। "আলম বাদ পড়ে যাওয়ায় আমি খুশি। ভালো হয় যদি আরো দু'একজন এভাবে বাদ পড়ে যায়। তাতে আমার খরচ কম হবে।"

শওকত খুশি হচ্ছে ভেবে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। শান্তিনগর মোড়ে বাস থামতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে বাস থেকে ফেলে দিয়ে আমরা নিজেরাও নেমে গেলাম। একটু পরে দেখলাম রিকশায় চেপে আলম পেটের খিদা চাগিয়ে তুলতে তুলতে আসছে। তাকে দেখেই ফেটে পড়লো শওকত, "ওরে আমার নবাবের পোলা রে, পকেটে হাত দিয়ে নবাবি চালেই যদি তুই বাসে উঠতে চাস তবে জাপানে জন্মালি না কেনো?"

বলতে বলতে শওকত হাসতে হাসতে বসে পড়লো। আলম রিকশা থেকে নেমে এসে তাকে কম করে হাসতে বললো।

"ওরে, অতো হাসিস না। বেশি হাসলে দাঁত খুলে পড়ে যাবে।"

এই কথা শুনে শওকত খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতে লাগলো।

অবশেষে তিনবার বাস পাল্টে আমরা পুরান ঢাকায় এসে হাজির হলাম। আমাদের যে হোটেলে যাওয়ার কথা সেটা ঠিক কোথায় আমরা কেউ জানি না। একমাত্র শওকত সেখানে একবার গেছে। সে বললো আরো খানিকটা হাঁটতে হবে।

আলম রেগে গিয়ে বললো, "শালা একটা হোটেল খুঁজে বের করছে একেবারে দুনিয়ার বাইরে। কোথায় কোন চিপার মধ্যে হোটেল কে জানে। এতো ঝক্কি জানলে আসতামই না।"

মুন্না হাসতে হাসতে বললো, "আমার মনে হয় ওখানে খেলে সত্যি বেহেস্তের খাবার পানসে মনে হবে। কেনো জানিস? খাবার ভালো বলে না, এতো খারাপ যে মুখের স্বাদ একেবারে জীবনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। হো হো হো..."

শওকত বিরক্ত হয়ে বললো, "আহা অত অস্থির হলে চলে? অমৃত খুঁজতে বের হয়েছিস, সমুদ্র সেচবি না?"

"অমৃত পাওয়া যাবে?"

"দেখা যাক। ফ্রেন্ডস, ফলো মি..."

বলে শওকত এগিয়ে গেলো। সে ছিলো সবার সামনে। আমরা একটু পিছনে থেকে তাকে অনুসরণ করছিলাম। পুরান ঢাকার চিপা সব গলির মধ্যে

দিয়ে শওকত আমাদের নিয়ে চললো। ধীরে ধীরে রাত গভীর হতে লাগলো। রাস্তায় মানুষজন কমে আসছিলো আর নিভৃত রাতের রাস্তায় আমরা হেঁটে চললাম। এর মধ্যে তিনবার শওকত রাস্তা ভুলে গেলো ফলে প্রত্যেকবার আমরা ফিরে এসে নতুন করে আবার শুরু করলাম। আমাদের মনে হচ্ছিলো আমরা বুঝি সত্যি অমৃতের খোঁজে সমুদ্র সেচার কঠিন দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছি। আমরা যেনো পুরাকালের সেই সব দৈত্যদের মতো, অমৃতের খোঁজে যারা সমুদ্র সেচে তোলপাড় করে ফেলেছিল। পার্থক্য একটাই, অমৃত খেয়ে দৈত্যরা অমর হতে চেয়েছিল। আর আমরা, কি জানি কি খেয়ে জীবনের মতো মুখের স্বাদ নষ্ট করতে চাচ্ছি।

দূরে এক জায়গায় অনেক আলোর ঝলমলানি দেখা গেলো। আমরা ভাবলাম এটাই আমাদের হোটেল বুঝি। সমুদ্রের খোঁজ পেয়ে গেছি ভেবে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। আর একটুখানি, তারপর আমরা সমুদ্র সেচতে লেগে যাবো। সমুদ্র সেচে আমরা তুলে আনবো এক আশ্চর্য অমৃত। যে অমৃত খেয়ে চিরদিনের জন্য আমাদের মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। অথবা যে অমৃত এতো ভালো হবে যে আমরা সারাজীবন সেটার কথা মনে রাখবো। সুদূর ভবিষ্যতে আমরা সে সময়কার নতুন প্রজন্মের কাছে সেই আশ্চর্য অমৃতের গল্প বলবো। বলবো কিভাবে কঠিন দুঃসাহসিক এক ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের মধ্য দিয়ে সমুদ্র সেচে আমরা তুলে এনেছিলাম সেই আশ্চর্য অমৃত।

না, অমৃত তুলে আনা আমাদের হয়নি। হঠাৎ কোথা থেকে দুম দুম বোমা ফাটার শব্দ ভেসে এসেছে আর আমাদের সামনে শওকত লাফিয়ে উঠেছে। তারপর সে ঝেড়ে দিয়েছে এক দৌড়।

আমরা ভাবলাম এরকমই বোধহয় করতে হবে। লাফিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিতে হবে। ফলে আমরাও লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলাম। তবে শওকত যেদিকে গেলো আমরা সেদিকে গেলাম না। আমরা পাশেই এক গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। শওকত সোজা দৌড়ে হারিয়ে গেলো। দূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো দুম দাম বোমার শব্দ। আর আমাদের পাশ দিয়ে রিকশাগুলো দুদ্দাড় দৌড়ে পালাতে লাগলো।

একটুপর জানা গেলো বোমা টোমা কিছু না। সামনে আলো ঝলমলে যে জায়গাটা আমরা দেখেছি সেটা একটা বিয়ে বাড়ি। বিয়ের উৎসব শুরু হয়েছে বলে সেখানে পটকা ফোটাচ্ছে। আমরা তখন বীর দর্পে গলি থেকে বের হয়ে পরস্পরকে বললাম যে আর যাই হোক অভিযানটা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ হচ্ছে। এখন এমন একটা কঠিন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে আমাদের নিয়ে আসার জন্য

শওকতকে আমরা খুঁজে বের করে গদাম দিবো। কিন্তু শওকতকে কোথাও পাওয়া গেলো না। মনে হচ্ছে পটকা ফোটার সুযোগটা নিয়ে সে পালিয়েছে।

এভাবে আমাদের শওকতের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার কঠিন ও দুঃসাহসিক অভিযান পুরান ঢাকার রাস্তায় মারা গেলো।

সাত

কার্ব মার্কেট যেনো এক মহা মিলন ক্ষেত্র। হাজার হাজার মানুষ এসে জমেছে এখানে। প্রতিদিন নতুন করে এসে জমছে আরো হাজার হাজার মানুষ। কতো মানুষ কতো ভাবে কতো জায়গা থেকে ছুটে আসছে। কার্ব মার্কেট যেনো এই সময়ের বঙ্গবাসীর এক মহাতীর্থ। গভীর রাতে এই মার্কেট কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আবার শুরু হয় তার শোরগোল। কতো অদ্ভুত কথাই না শোনা যায় এখানে-

"সোনার চাক্কা ভাই সোনার চাক্কা, মেঘনা শ্রিম্প হচ্ছে বাংলাদেশের সোনার চাক্কা। ইয়া বড় বড় গলদা চিংড়ির চাষ হয় এখানে। ঐ চিংড়ি তো খাইতে পারবেন না, শেয়ার কিনে নিয়ে যান- বসে বসে দেখবেন।"

"ভাই শাইনপুকুর নিবেন নি? শাইনপুকুর কিন্যা নিয়া যান, পুকুরে ইলিশ মাছের চাষ কইরেন।"

"আরে ইমাম বাটন হচ্ছে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে বড় বোতাম কোম্পানি, এই কোম্পানির শেয়ার ভালো না মানে? মজা করেন?"

"সেল সেল সেল... চল্লিশ বছর ধরে মাথা ঠাণ্ডা করা কদুর তেলের কোম্পানি সেল... তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা হইবো, শেয়ার কিনলে দিল ঠাণ্ডা..."

"শোনেন ভাই, ডুন্নু ফেব্রিক্স এর প্রোডাকশন এখনও শুরু হয়নি। তিনবার শুরু করতে গেছে, তিনবারই কারখানার ছাদ ধ্বসে পড়েছে। এখনই এইটার দাম ছয়শো টাকা। প্রোডাকশন শুরু হইলে দাম কই যাইবো চিন্তা করেন..."

"টিভিতে শাইনপুকুরের এ্যাডটা দেখছেন নাকি? আরে বাবা ব্রিজের কন্ট্রাক্ট পেয়েই কতো বড় বাড়ি বানাতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছেন না বাঁশটা কই

দিয়ে দিবে? উদ্বোধনী দিনে ঐ ব্রিজ মন্ত্রীসহ ভেঙে পড়বে।"

"ও আপা আলু সেল পটল সেল সিঙ্গাড়া সেল খাইয়া যান (আপা রাস্তার পাশ দিয়ে রিকশা করে যাচ্ছে)।"

"তৃপ্তি ইন্ডাস্ট্রিজ কমদামে সেল। সাথে একটা বেনসন ফ্রি।"

"সিঙ্গারের শেয়ার? ও বাবা, ও জিনিস দেখেই শান্তি (সিঙ্গারের একটা শেয়ারের দাম বাইশ হাজার টাকা)।"

"আরে দোস্ত তুই? কতদিন পর দেখা? হঠাৎ রাস্তায়, শেয়ার বাজার অঞ্চলে, হারিয়ে যাওয়া মুখ চমকে দিয়ে বলে, বন্ধু, কি খবর বল..."

"আপা জান কোরবান, দিল সেল দিল সেল, বিনি পয়সায় সেল (এই আপাও রিকশা করে যাচ্ছে)।"

"আরে আজিজ পাইপ যদি পাঁচ হাজারে যায় তবে করিম পাইপ অন্তত দুই হাজারে তো যাবেই..."

"বেশি লোভ করা ভালো না হে। লোভে পাপ..."

"নিলে নেন, না নিলে যান গা। প্যাঁচাল ভাল্লাগে না।"

"হ, এই দাম দিয়া শেয়ার কেনন লাগবো না। ফটোকপি কইরা বাড়িত নিয়া যান গা। বইসা বইসা দেইখেন।"

চারদিকে আনন্দময় পরিবেশ। আনন্দিত কোলাহল। শেয়ার বাজারকে কেন্দ্র করে সুখময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে মানুষ। আমরা, মানে আমি আর মুন্না ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কোলাহল আরেকটু বাড়িয়ে তুললাম। খানিকক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরাফেরার পর আমরা একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। মানুষের হাতে হাতে টাইকোর শেয়ার শোভা পাচ্ছে। আমাদের মনে হচ্ছিলো টাইকোর শেয়ারগুলো আমাদের দেখলেই ভেংচি কাটছে। যেদিকে আমরা তাকাই সেদিকেই সেগুলো দাঁত কেলিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসে। শেয়ারগুলোর এমন অসভ্য আচরণে আমরা মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। না হয় একবার আমরা টাইকোর শেয়ার কিনে ধরা খেয়েছি, তাই বলে এভাবে ভেংচি কেটে আমাদের উপহাস করা শেয়ারগুলোর নিতান্তই ছোটলোকি আচরণ বলে আমাদের মনে হলো। আমাদের ইচ্ছে হচ্ছিলো ছুটে গিয়ে শেয়ারগুলোর গলা টিপে ধরি, তারপর সেগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিই।

মুন্না বললো আমাদের উচিত আবার টাইকোর শেয়ার কেনা। কিনে দাম না বাড়া পর্যন্ত সেগুলোকে বাক্সবন্দি করে রেখে দিয়ে দাম বাড়ার পর সেগুলো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিক্রি করে দেয়া উচিত। শেয়ারগুলোর উপহাসের এটাই হবে উপযুক্ত জবাব। এভাবেই যদি এই বজ্জাত শেয়ারগুলোর কিছু শিক্ষা হয়।

এর মধ্যে পর পর দুইদিন শেয়ার বাজার ডাউন গিয়েছে। পর পর দুইদিন লাইন ধরে সব শেয়ারের দাম কমে গিয়েছিলো। টাইকোর দাম কমে আবার পঞ্চান্ন টাকায় চলে গিয়েছিলো। গতকাল থেকে আবার দাম বাড়তে শুরু করেছে। ষাট টাকা করে আমরা আবার একশো টাইকোর শেয়ার কিনলাম। শেয়ারটা ধরেই সদ্যজাত শিশুর মতো যত্ন করে সেটাকে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো মুন্না। বললো, "এটার মধ্যে শয়তান থাক আর যাই থাক, এইবার এটাকে আর ছাড়াছাড়ি নাই। চল।"

এরপর আমরা গেলাম প্রাইমারি শেয়ারের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জোগাড় করতে। মার্ক সু নামে একটা কোম্পানি প্রাইমারি শেয়ার ছাড়বে। প্রাইমারি শেয়ারের চাহিদা এখন খুব বেশি কারণ একশো টাকার একটা প্রাইমারি শেয়ার বাজারে আসার সাথে সাথে দেড়-দু' হাজার টাকা দাম উঠে যাচ্ছে। একশো টাকা বিনিয়োগ করে লাভ দেড় দুই হাজার টাকা বা তার বেশি। কম বিনিয়োগে বেশি লাভের জন্য এ হচ্ছে সোনার খনি। তবে প্রাইমারি শেয়ার পেতে হলে নির্দিষ্ট ফর্মে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। ঐ অ্যাপ্লিকেশনের উপর লটারি হয়। লটারিতে যাদের নাম ওঠে শুধু তারাই শেয়ার পায়। অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য মুন্না তার মাকে ভুজুং দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করেছে। ভুজুং দেয়ার জন্য অবশ্য তাকে কিছু চাল চালতে হয়েছে। দু'শো টাকা লস করে বাসায় গিয়ে সে বলেছে ছ'শো টাকা লাভ করেছে। সত্যি সত্যি ছ'শো টাকা লাভ করলে সে বলতো দু' হাজার টাকা লাভ হয়েছে; আর দু' হাজার লাভ হলে বলতো যে আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেছে, ঘষা দিলেই টাকা পড়বে। আমি অবশ্য এধরণের ভুজুংয়ের অর্থ বুঝি না। মিথ্যেই যদি বলতে হয় তবে কম করে বলার কি? একবারে ছয় হাজার টাকা লাভ হয়েছে বললে কি ক্ষতি হতো? অবশ্য মুন্নার মা টাকা দেখতে চাইলে সে কি করতো আমি জানি না।

অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জোগাড় করার জন্য আমরা স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকলাম। মেম্বারদের কাছে থেকে বিনা পয়সায় ফর্ম পাওয়ার কথা। দোতলা তিনতলার বেশিরভাগ মেম্বারদের ঘরে এতো ভিড় যে আমরা সেগুলোতে ঢুকতে পারলাম না। চারতলার এক কোনায় এক মেম্বারের ঘর দেখলাম ফাঁকা, একটা বিটকেলে চেহারার লোক বসে বসে কান চুলকাচ্ছে। আমরা ফর্মের কথা বলতে থেকে সে আমাদের দাঁত খিচিয়ে জানিয়ে দিলো যে ফর্ম আরো সাত দিন আগে শেষ হয়ে গেছে। আমরা দেরি করে ফেলেছি এবং আমাদের মতো দেরি করা লোকদের উচিত ব্যবসার চিন্তা বাদ দিয়ে বসে বসে ডুগডুগি বাজানো। আমরা জানতাম যে ফর্ম আরো সাতদিন আগে শেষ হওয়ার কথা না কারণ ফর্ম ছেড়েছে তিনদিন

আগে। কাজেই আমরা লোকটাকে বলে দিলাম যে তার দাঁতগুলো এভাবে যেখানে সেখানে খিচানো উচিত না, আর আমরা অন্য কোথাও থেকে ফর্ম এনে তার মাথায় ডুগডুগি বাজাবো। এতে লোকটা হা করে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা আরেকটা ঘরে ঢুকলাম। দু'জন মানুষ ঘরটাতে বসে আছে আর টেবিলের উপর মার্ক সু'র অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম স্তূপ করে রাখা। সেখান থেকে দু'টা ফর্ম আমাদের দেয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে একজন আমাদের জানালো এসব ফর্ম দেয়া যাবে না, এগুলো একজনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা। তার পাশের লোকটা তখন খেঁকিয়ে উঠে বললো, "আরে দূর মিয়া, এতো ফর্ম দিয়ে আপনি কি পূজা করবেন? দেন না ওদেরকে দু'টা ফর্ম।"

প্রথম ব্যক্তি তখন অনিচ্ছায় একটা ফর্ম আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "নেন, আরো লাগলে এটাকে ফটোকপি করে নিয়েন।"

"ফটোকপি করলে হবে?"

"হবে।"

পাশের ব্যক্তিটি আবার খেঁকিয়ে উঠলো, "দূর মশাই, আপনি তো সাংঘাতিক ত্যাঁদড় দেখি। দেন না আরেকটা ফর্ম ওদের।"

প্রথম লোকটা আরেকটা ফর্ম আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলো। ফর্ম নিয়ে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে বের হয়ে আমাদের চোখে পড়লো ফুটপাতে মার্ক সু'র অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম গড়াগড়ি খাচ্ছে। দশ টাকা করে বিক্রি করছে। মুন্না বললো, "কাণ্ড দেখেছিস? এখানে এতো ফর্ম লটকাচ্ছে আর আমরা যতো ফকিন্নির পুতেদের কাছে চেয়ে বেড়াচ্ছিলাম। দাঁড়া, আর দু'টা ফর্ম নিয়ে নেই।"

দুম করে একটা থাবা এসে আমার পিঠে আছড়ে পড়লো, "রানা মামা, চাকা চাকা বুম বুম পা পা, খবর কি? পঞ্চাশ টাকার বেশি লাভ করোনি তো?"

বললাম, "চারটা পঞ্চাশ টাকা লস করেছি মামা।"

ফিরোজ মামা হা করে চেয়ে থেকে বললো, "এটা তুমি কি করলা মামা? এই বাজারে কেউ লস করে?"

"সব হচ্ছে মুন্নার ফাটা কপালের দোষ বুঝলা মামা..."

পাশ থেকে মুন্না বললো, "ফাটা কপাল জোড়া দিচ্ছি দাঁড়া না। এমন ব্যবসা করবো যে সবার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।"

"এই তো শাবাশ, এমনই দরকার।" ফিরোজ মামা বললো। "একটা মেম্বারশিপ নিয়ে নাও মামা। মেম্বারদের এখন কেমন রমরমা অবস্থা চিন্তা করো। দিনে লক্ষ লক্ষ শেয়ার বেচা কেনা হয় আর প্রতি শেয়ারে এরা কমিশন পায়।

ছয় মাস আগে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মেম্বার হওয়া যেতো। এখন কতো লাগে জানো? কমপক্ষে এক কোটি।"

"এক কোটি?" মুন্না প্রশ্ন করলো। "শুনলাম খুলনায় স্টক এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আর সেখানে দু লাখ টাকা দিয়ে মেম্বার হওয়া যাচ্ছে?"

আমাদের পাশ থেকে এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললো, "কি বলেন ভাই? দুই লাখে মেম্বারশিপ? বিশ লাখ দিবো ভাই বিশ লাখ যদি একটা মেম্বারশিপ জোগাড় করে দিতে পারেন। খুলনা বগুড়া যেখানকারই হোক।"

মুন্না আমার দিকে চেয়ে বললো, "হে হে, অফারটা তো ভালো, কি বলিস? ওবায়েদকে বলে দু লাখ টাকায় একটা মেম্বারশিপ কিনে বিশ লাখে বিক্রি করে দিলে হয়।"

"ওবায়েদের কথায় বিশ্বাস কি? সে কথা যতো বলে চাপা মারে তার চেয়ে ঢের বেশি।"

"সেটা ঠিক। ওবায়েদের কথায় ভরসা নাই।"

সেই ব্যক্তি আমাদের নাছোড়বান্দার মতো ধরে বসলো মেম্বারশিপ জোগাড় করে দেয়ার জন্য। মেম্বারশিপ তাকে জোগাড় করে দিতেই হবে। আমাদেরকে তার ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে বার বার করে বলে সে চলে গেলো।

পরদিন আবার সব শেয়ারের দাম কমে গেলো। যখন শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে তখন কেনার জন্য হুটোপুটি লেগে যায়। কাড়া কাড়ি ধরা ধরি দেখে মনে হয় বাজারে শেয়ার কম পড়ে গেলো। আর যখন দাম কমতে থাকে তখন কেউ কিনতে চায় না। মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়ায়।

এবারের দাম কমা নিয়ে অবশ্য বেশি আতঙ্ক হলো না। একদিন পরেই আবার দাম বাড়তে শুরু করলো। এক ফাঁকে আমরা আমাদের শেয়ার আশি টাকা করে বিক্রি করে দিলাম। শেয়ার বাজারে আসার পর এই প্রথম আমাদের লাভ হলো। আমরা এতে আনন্দিত হয়ে উঠলাম আর মুন্না বললো এই লাভের কথা সবাইকে জানানো দরকার। এমন একটা ব্যাপার কাউকে না জানানোটা অপরাধ। আমাদের উচিত এই মুহূর্তে একটা মাইক ভাড়া করে নিয়ে বেরিয়ে পড়া আর মাইকে মুহুর্মুহু আমাদের লাভের কথা ঘোষণা করা।

"কি করা যায় বলতো?" মুন্না প্রশ্ন করলো। "দু হাজার টাকা লাভ। এ খবর কাউকে না জানালেই না। চল একটা মাইক ভাড়া করি। আজকে সারাদিন ঢাকা শহর ঘুরে মাইকে আমাদের লাভের কথা ঘোষণা করি।"

মুন্নার বুদ্ধিটা আমার মন্দ লাগলো না। ব্যাপারটা আমার অভিনব ও

চমকপ্রদ বলে মনে হলো। কিন্তু আমার মনে হলো এতে করে সবাই হাসাহাসি করবে। তারা আমাদের লাভটা সহ্য করতে না পেরে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে আর আমাদের দিকে চেয়ে খিক খিক করে হেসে এমন ভাব করবে যেনো আমরা আসলে লাভ টাভ কিছু করিনি, শুধু তাদেরকে দেখানোর জন্য মিছে কথা বলছি। তাছাড়া ছিনতাইকারীরাও খেপে গিয়ে আমাদের লাভের টাকা কেড়ে নেয়ার জন্য ওঁত পেতে থাকতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে সারাদিনের জন্য মাইক ভাড়া করতে দু' হাজার টাকার বেশি পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সবদিক বিবেচনায় আমার মনে হলো মাইক নিয়ে বের হয়ে পড়া একটা চমৎকার ব্যাপার হলেও সেটা না করাই ভালো। তবে আমরা একমত হলাম যে এতো বড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। তখন মুন্না ডান হাতটা পেতে দিয়ে বললো, "দে, থাবা দে।"

আমি দিলাম থাবা। ডান হাতটা তুলে সর্ব শক্তিতে বসিয়ে দিলাম মুন্নার ডান হাতের উপর। এতে করে লাভ যেটা হলো, আমাদের দু' জনেরই হাত লাল হয়ে উঠলো আর আমরা হাত চেপে ধরে লাফাতে লাগলাম।

এভাবে আমরা ব্যবসায় আমাদের প্রথম লাভ করাটা স্মরণীয় করে রাখলাম।

কিন্তু পৃথিবী একটা হিংসুটে, নিষ্ঠুর জায়গা। পৃথিবী তার সন্তানদের আনন্দ বেশি সময় সহ্য করতে পারে না। জন্ম দিয়ে সে যেমন আবার মেরে ফেলে, তেমনি আনন্দ দিয়ে পরক্ষণেই তা কেড়ে নেয়। আমাদের আনন্দও সে বেশিক্ষণ সহ্য করলো না। পরদিন আমরা যখন শেয়ার বাজারে পৌঁছলাম, তখন সেখানে আগুন লেগেছে। লোকজন সব পাগল হয়ে গেছে আর দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে। না, সত্যি সত্যি আগুন সেখানে লাগেনি, তবে কার্ব মার্কেটের যে অবস্থা তাকে আগুন লাগা অবস্থাই বলা যায়। টাইকোর শেয়ার বিক্রি হচ্ছে একশো আশি টাকা করে। একদিনে এ শেয়ারের দাম বেড়েছে একশো টাকা। অথচ স্টক এক্সচেঞ্জে অফিশিয়ালি এটার দাম মাত্র পাঁচ টাকা বেড়ে পঁচাশি টাকা হয়েছে। মানে বাইরে প্রায় একশো টাকা বেশি দামে শেয়ারটা বিক্রি হচ্ছে। শুধু টাইকোর শেয়ার না, প্রতিটি কোম্পানির শেয়ারই এমন অস্বাভাবিক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। কিছু কোম্পানির শেয়ার হাজার টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। লোকজন সব পাগল হয়ে শেয়ার কিনছে আর যারা এরকম চড়া দামে বিক্রি করছে হাসির চোটে দাঁত ছাড়া তাদের মুখের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এই হাসিটা আমরাও হাসতে পারতাম। শুধুমাত্র একটা রাত বসে থাকলেই আমরা দু

হাজার টাকার জায়গায় বারো হাজার টাকা লাভ করতে পারতাম ভেবে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। মুন্নার দিকে চেয়ে দেখি সে অধিক বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে। তার চোখে মুখে যে অপরিসীম বিস্ময়, আর একটা দিন শেয়ারটা ধরে না রাখার জন্য যে পরিমাণ আফসোস, হিসেব করে খরচ করলে সেই পরিমাণ বিস্ময় আর আফসোস দিয়ে একটা সাধারণ মানুষের মোটামুটি গোটা জীবন পার হয়ে যেতে পারে।

ঘুরতে ঘুরতে মোস্তাকদের সাথে দেখা হয়ে গেলো। ওরা ওদের রেজিস্ট্রি করা জায়গায়, মানে স্টক এক্সচেঞ্জের পাশের ফুটপাতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমরা কাছে গিয়ে কি খবর জানতে চাইলাম। উত্তরে ওরা গাল ফুলিয়ে বাতাস ছেড়ে ফু জাতীয় একটা শব্দ করলো। আমরা জানতে চাইলাম শব্দটার অর্থ কি। উত্তরে ওরা আবার বললো, "ফু..."

শব্দটার মানে এবারেও বুঝতে পেরেছি বলে আমাদের মনে হলো না। আমরা ভাবলাম ওদের এই ফু ফু করা বন্ধ করার জন্য কিছু করা দরকার। আমরা ওদেরকে বললাম কি হয়েছে। আমাদের শেয়ার আমরা কালকে আশি টাকা করে বিক্রি করে দিয়েছি আর আজকে সেটা একশো আশি টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। আমরা বললাম যে এই কাণ্ড দেখে আফসোসে আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে।

ওরা গম্ভীর মুখ করে আমাদের কথা শুনলো। তারপর ওদের ফু ফু করা বন্ধ করে বললো, "এতো আফসোস করার কিছু নাই। কয় টাকা আর লস দিলি তোরা? গতকাল আমরা দুশো শেয়ার বিক্রি করেছিলাম বাষট্টি টাকা করে, আজকে সেটা একশো আটাশি টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। পঁচিশ হাজার দুশো টাকা খাড়ার উপর লস। কাল না করে আজ বিক্রি করলেই পঁচিশ হাজার টাকা লাভ হয়ে যেতো। শালার মেজাজটা খালি বিলা হয়ে যাচ্ছে। আর তোরা আছিস তোদের ঐ কয় টাকা লস নিয়ে, ফুঃ..."

শেষ 'ফুঃ' টা শুনে আমাদের রাগ হলো। বেটারা কেমন তাচ্ছিল্য করছে আমাদের! কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম, আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশি লেজে গোবরে অবস্থায় আছে। এটা ভেবে আমাদের দুঃখবোধ দূর হয়ে গেলো। পৃথিবী নিষ্ঠুর জায়গা হলেও ততটা নিষ্ঠুর নয়। এই তো এদের পাওয়া গেছে যারা আমাদের চেয়েও বড় লস দিয়েছে। খুঁজলে নিশ্চয় আরো অনেককেই পাওয়া যাবে। অতএব আমাদের আফসোস করার কিছু নেই।

মুন্না ইতিমধ্যে তার মাকে ছেড়ে বড় ভাইকে ভুজুং দিতে শুরু করেছে। বড় ভাইয়ের সামনে বড় একটা মুলা ঝুলিয়েছে সে। তার বড় ভাই ইঞ্জিনিয়ার এবং

ভালো চাকরি করেন। সাধারণত সকাল বেলা খাবার টেবিলে মুন্নার সাথে তার দেখা হয়। এক সকালে তিনি অফিস যাবার জন্য তৈরি হয়ে খাবার টেবিলে এসে বসলেন। মুন্না তার আগেই টেবিলে হাজির ছিলো। তিনি এসে বসতেই মুন্না তার দিকে চেয়ে হে হে করে হাসতে লাগলো। ভাই প্রথমটায় ধন্দে পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন তিনি বোধহয় উল্টাপাল্টা করে কাপড় পড়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাপড় চোপড় পরখ করে দেখলেন তিনি। তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঘরে ফিরে গিয়ে আয়নায় ঘুরে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে দেখলেন। প্যান্টের চেইন ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে তিনবার চেইনটা খুললেন আর লাগালেন। কোথাও হাস্যকর কিছু খুঁজে না পেয়ে ডাইনিংয়ে ফিরে এসে দেখলেন মুন্না তেমনি হে হে করে হেসে যাচ্ছে। ভাই আবারও ধন্দে পড়ে অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে মুন্নার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুই হাসছিস কেনো?"

মুন্না হে হে বাদ দিয়ে জোরে জোরে হো হো করে হাসতে লাগলো। ভাই চোখ কুচকে তার দিকে চেয়ে রইলেন। মুন্না অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে জানালো যে ভাইয়ের জন্য তার মায়া হচ্ছে, তাই হাসছে।

এ কথায় ভাই খাওয়া ভুলে হা করে রইলেন। মুন্না অবশেষে ব্যাপারটা খোলাসা করে বললো, "আহারে, কি কষ্ট তোমার। সেই সকাল বেলা সেজে গুঁজে ফিটফাট হয়ে অফিসে যাও, সারাদিন গাধার খাটনি খেটে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসো। ক' পয়সা পাও ওটা করে?"

ভাই অবাক হয়ে বললেন, "তাহলে কি করতে হবে?"

মুন্না উত্তেজিত হয়ে বললো, "চাকরি করে কি হয়? চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার লাইনে চলে এসো। টাকা পয়সা নিয়ে শেয়ার বাজারে নেমে পড়লে দিনে লাখ টাকা লাভ হবে।"

"দিনে লাখ টাকা লাভ?"

"তো আর বলছি কি?"

"তুই কয় টাকা লাভ করলি? শুনলাম কয়দিন খুব লাফিয়ে তুই মাত্র ছয়শো টাকা লাভ করেছিস?"

মুন্না কিছুটা গম্ভীর হয়ে গলা খাঁকারি দিলো। ছয়শো টাকা লাভ সে করেনি, করেছে দুইশো টাকা লস। মায়ের কাছে দুইশো টাকা লসকেই সে ছয়শো টাকা লাভ বলে প্রচার করেছে। কিন্তু সে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী। এরপরে সে দু' হাজার টাকা লাভ করেছে আর ঢোল বাজিয়ে মায়ের কাছে বলেছে যে বড়লোক হওয়ার কাছাকাছি সে পৌঁছে গেছে। সে কাহিনী বোধহয়

এখনো বড় ভাই পর্যন্ত পৌঁছেনি। সে একটু গম্ভীর গলায় বললো, "আর কটা দিন যেতে দাও তারপর দেখবে।"

"বটে! তা আমাকে এখন কি করতে হবে? চাকরি ছেড়ে তোর মতো শেয়ার বাজারে সেল সেল বলে ডাক ছাড়তে হবে?"

মুন্নার একটু আঁতে ঘা লাগলো। বড় ভাইয়ের শব্দের ব্যবহার তার পছন্দ হলো না। পৃথিবীর মানুষগুলো এরকম। শব্দ ব্যবহারে অবিবেচক আর অমিতব্যয়ী। আরো মোলায়েম এবং কোমল শব্দ ব্যবহারে যখন বিশ্বজয় করে ফেলা যায় তখন তারা সেটা না করে ঢাক ঢোল পিটিয়ে কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলে।

মুন্না আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললো, "তুমি ব্যাপারটা যেরকম ভাবছো সেরকম না। শেয়ার বাজারে ঢের বয়স্ক লোক আছে। তারা যে সবাই সেল সেল বলে ডাক ছাড়ছে তা না। তাছাড়া কার্ব মার্কেটেই ব্যবসা করতে হবে আর সারাদিন সেখানে পড়ে থাকতে হবে এমনও না। মেম্বারদের মাধ্যমেও ব্যবসা করা যায়। শেয়ার কিনে ধরে রেখে কয়েকদিন পর দাম বাড়লে বিক্রি করলেই হয়। সে জন্য বেশি সময়ও দেয়ার দরকার নেই।"

"ব্যাপার যদি এরকমই হয় তাহলে চাকরি ছাড়তে হবে কেনো? চাকরি করেও তো সেটা করা যায়।"

"আহা দিনে লাখ টাকা আয় করলে চাকরি করতে যাবা কোন দুঃখে?"

বলে মুন্না হাসতে লাগলো। বড় ভাই চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে রাজি না হলেও মুন্নাকে কিছু টাকা দিলেন যাতে সে লাখ টাকা লাভ করা শুরু করতে পারে। মুন্নার ইচ্ছে ঐ টাকা দিয়ে সে দামি শেয়ার কিনে বড় দাও মারবে। আর সে শেয়ার সে কিনতে চায় মেম্বারের মাধ্যমে। কাজেই আমরা আবার স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকলাম। এক মেম্বারের কাছে মুন্না একশো টিসাই কোম্পানির শেয়ারের অর্ডার দিলো। টিসাইয়ের শেয়ারের দাম চারশো একুশ টাকা। একশো শেয়ারের দাম বেয়াল্লিশ হাজার টাকা বুঝে নিয়ে মেম্বার সাহেব দু'দিন পর শেয়ারটা মুন্নার হাতে দিয়ে বললেন, "নিয়ে আবার এখনই বিক্রি করে দিও না। টিসাই দু' হাজার পর্যন্ত চোখ বুজে চলে যাবে।"

মুন্না বললো যে জীবন থাকতে দু' হাজার টাকার এক পয়সা নীচে সে এ শেয়ার বিক্রি করবে না।

শেয়ার হাতে করে আমরা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে বের হতেই ভিড় করে লোকজন আমাদের ঘিরে ধরলো। সবাই মুন্নার শেয়ার নেয়ার জন্য লাফাতে লাগলো। মুহূর্তে তার শেয়ারের দাম উঠে গেলো সাড়ে

পাঁচশো টাকা। মুন্না আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, "তেরো হাজার টাকা লাভ তো এখনই হয়ে যাচ্ছে রে। দিবো নাকি বিক্রি করে?"

আমি বললাম যে সেটা উচিত কাজ হবে না কারণ তাতে করে মেম্বারের কাছে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে। দু' হাজার না হলেও অন্তত এক হাজার পর্যন্ত দাম ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, আর আমার ধারণা তিন চারদিনেই দাম এক হাজার উঠে যাবে। আমার কথা শুনে মুন্না শেয়ারটাকে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো।

আমি তখনও জানি না কি ভুল পরামর্শ আমি মুন্নাকে দিয়েছিলাম।

আট

একদিন সকালে মুন্না এসে বললো সে লটারিতে প্রাইমারি শেয়ার জিতেছে, সেটা আনতে যেতে হবে। আমি খুশি হয়ে বললাম, "জিতেছিস? শাবাশ বাঘের বাচ্চা, এই প্রথম আমি চেনা জানা কাউকে লটারি জিততে দেখলাম।"

"আরে না অতো খুশি হওয়ার কিছু হয়নি। শেয়ার জিতেছি মাত্র একটা।"

একটা শেয়ার জিতেছে মানে আমি বুঝলাম না। সাধারণত শেয়ার বিক্রি হয় লটে। এক লটে পঞ্চাশ বা একশোটা শেয়ার থাকে। এর নীচে শেয়ার কেনা যায় না।

"একটা শেয়ার জিতেছিস মানে কি? এক লট?"

"আরে না লট ফট কিছু না। হুধা একটা।"

"হুধা একটা আবার কি করে জেতে? লট ছাড়া শেয়ার বিক্রি হয় নাকি?"

"এমনিতে হয় না। তবে এখন ডিমান্ড বেশি বলে ব্যাটারা গরম দেখিয়েছে। একটা শেয়ার দিয়েছে।"

"হাতে আগুন নিয়ে বসে আছে নাকি যে এতো গরম দেখাচ্ছে?"

"এখন ওদেরই সময়, গরম দেখাবে না? চল শেয়ারটা নিয়ে আসি।"

"চল।"

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ধানমন্ডির একটা কমিউনিটি সেন্টার থেকে

শেয়ার দেয়া হবে। গিয়ে দেখি বেজায় ভিড়। ভিড়ে ভিড়ে ভিড়াক্কার। ভিড় ঠেলে শেয়ারটা সংগ্রহ করলো মুন্না। সেটা হাতে করে বেরিয়ে আসতেই লোকজনের হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেলো। চেঁচিয়ে বললো, "ভাই শেয়ারটা বিক্রি করবেন?"

"কতো?"

"এক হাজার দিবো।"

মাত্র একটা শেয়ার পাওয়াতে মুন্নার মেজাজটা একটু খিচে ছিলো। হাতে হাতে নয়শো টাকা লাভ হওয়ার কথা শুনে মন একটু ভালো হলো তার। ভাব দেখিয়ে বললো, "নাহ, আরেকটু দেখি।"

আরেকজন চেঁচিয়ে বললো, "কি আর দেখবেন ভাই? শোনেন, উনিশশো টাকা দিই, দিয়ে দেন।"

এক লাফে নয়শো টাকা দাম বেড়ে যাওয়ায় আমরা বিস্মিত হয়ে পড়লাম। মুন্না বললো, "দিবেন যখন একশো টাকা কম দিবেন কেনো? দু' হাজারই দেন।"

লোকটা রাজি হয়ে গেলো। মুন্না শেয়ারটা বিক্রি করে টাকাটা পকেটে ভরে বললো, "একটা শেয়ারের দাম দু' হাজার টাকা। তাও শেয়ারটা এখনও মার্কেটে আসেনি। কি অবস্থা চিন্তা কর।"

আমার এক সহপাঠীর অভ্যাস ছিলো ইংরেজি শব্দ বিকৃত করে বলা। অনেক ইংরেজি শব্দকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অন্যভাবে বলতো সে। যেমন 'সরি' কে বলতো- 'সরগরি'। 'স্লিপ' কে বলতো 'সিলপিপ'। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিকৃত করে ফেললেও প্রসঙ্গ জানা থাকলে তার কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হতো না। অনেকদিন পর তার কথা মনে পড়ে গেলো আমার। আমি তার অনুকরণে বললাম, "অবস্থা সিরিগাছ।"

ফেরার পথে আমাদের ওবায়েদের সাথে দেখা হলো। সে একটা স্কুটারে করে যাচ্ছিলো। আমাদের দেখে স্কুটার থামিয়ে কাছে এলো সে, "ঐ আমি এজিএম খেতে যাচ্ছি। তোরা যাবি?"

এজিএম খাওয়াটা কি ধরণের খাওয়া আমরা বুঝতে পারলাম না। এ কি খাবার রে বাবা, এ রকম বিচিত্র নাম তো কখনো শুনিনি!

"হে হে, জীবনে অনেক রকম খাবারের নাম আমরা শুনেছি, কিন্তু এজিএম খাবার কথা এই প্রথম শুনলাম। কি রকম খাবার এটা? কোথায় পাওয়া যায়? কিভাবে খায়?"

"আরে বেটা, শেয়ার ব্যবসা করছিস আর এজিএম কি জানিস না। এজিএম হচ্ছে এনুয়াল জেনারেল মিটিং। কোম্পানিগুলো এই মিটিংয়ে তাদের

লাভ ক্ষতির হিসেব দেয়।"

"ও আচ্ছা। শুনে তো ভালোই মনে হলো কিন্তু এর মধ্যে খাওয়া দাওয়ার কিছু তো পাওয়া গেলো না।"

"মিটিংয়ে ভালো খাওয়া দেয়।"

"বটে! কিন্তু ঐ আমরা তো তোর ঐ কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার না, আমরা কিভাবে যাবো?"

"আরে এখন এতো হুড়োহুড়ি হয় যে এইসব কেউ দেখে না। গেলে চল।"

আমরা ভাবলাম এজিএম একবার খেয়ে দেখা আমাদের উচিত। এতে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাড়ার সমৃদ্ধ হবে আর পরবর্তীতে আমরা আমাদের মতো অনভিজ্ঞ কাউকে এজিএম খাওয়ার কথা বলে ভড়কে দিতে পারবো। কাজেই আমরা ওবায়েদের সাথে রওনা দিলাম। একটা বড় মাঠে এজিএমের আয়োজন করা হয়েছে। মাঠের একপ্রান্তে প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে। প্যান্ডেলের সামনে বানানো মঞ্চের উপরে সারিবদ্ধ চেয়ারে কয়েকজন বসে রয়েছে। একজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে আর মঞ্চের সামনে চেয়ারে বসে শ্রোতারা শুনছে। চেয়ারের চাইতে মানুষের সংখ্যা ঢের বেশি, তাই বহু মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ শ্রোতারই আসলে শোনার কোনো ইচ্ছে নেই। এইসব এজিএমে শেয়ার হোল্ডারদের খাবার আর উপহার দেয়া হয়। সেইসব জিনিস কখন দেয়া হবে সেটা নিয়ে উৎসুক সবাই।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন মঞ্চের মানুষদের সঙ্গে দর্শকদের উত্তপ্ত তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে। কি নিয়ে তর্কাতর্কি চলছে তা শোনার জন্য আমরা দাঁড়ালাম। কিন্তু এতো উত্তপ্ত ঝড়ের মতো বাক্য বিনিময় চলছিলো যে কারো কথা ভালো করে বোঝা গেলো না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে আমরা বিরক্ত হয়ে গেলাম। ওবায়েদ বললো যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। এরা এখানে মারামারি করুক আমরা এই ফাঁকে খাবার নিয়ে নেই।

মঞ্চের একপাশে তখন প্যাকেট খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম। লাইনে সবে মাত্র দাঁড়িয়েছি, তখন কি যেনো একটা হলো, দর্শকদের সারি থেকে একটা চেয়ার উড়ে গেলো মঞ্চের দিকে। তারপরই শুরু হয়ে গেলো হুড়োহুড়ি, মারামারি। কে কাকে মারছে ঠিক নাই। দর্শকরা লাফিয়ে মঞ্চে উঠে পড়লো আর মঞ্চের লোকগুলো লাফিয়ে পড়লো নীচে। হাতের কাছে চেয়ার ছিলো প্রচুর। মঞ্চ আর মাঠে শুরু হলো চেয়ার ভাঙার প্রতিযোগিতা। লোকজন লাফিয়ে লাফিয়ে একে অপরের পিঠে চেয়ার ভাঙছে। আমাদের সামনের এক লোক একটা চেয়ার তুলে ছুড়ে মারলো আর সেটা উড়ে গিয়ে

আছড়ে পড়লো তার সামনের আরেকজনের পিঠে। দ্বিতীয় লোকটা একটা চিৎকার দিয়ে শুয়ে পড়লো। ওবায়েদ কি ভাবলো কে জানে, সামনে এগিয়ে একটা লোককে টেনে লোকটার মুখ বরাবর দুম করে ঘুষি চালিয়ে দিলো। ঘুষি খেয়ে লোকটা ওবায়েদের গায়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। তখন দু' জনের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো তুমুল মরণপণ লড়াই। দু'জনেই দু'জনকে পাকড়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো আর আশেপাশের কয়েকজন ওদের দু'জনকে ফুটবল ভেবে যুত মতো লাথি দিয়ে গেলো। চারদিকে হট্টগোল, মারামারি আর চেয়ার ভাঙার শব্দ। এর মধ্যে মারামারি করতে করতে ওবায়েদ কোথায় হারিয়ে গেলো বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি মুন্নাও নাই। সেও মারামারি করতে গেলো কিনা কে জানে। আমি ভাবলাম এজিএম খাওয়ার নিয়ম বোধহয় এরকমই। প্রথমে মারামারি করতে হয়। একে অপরের পিঠে চেয়ার ভাঙতে হয়। এসব করার পর পেটের খিদেটা যথেষ্ট উসকে ওঠার পর হয়তো খাওয়া দাওয়া শুরু করতে হয়। খাওয়ার প্রক্রিয়াটা যথেষ্ট জটিল বলে আমার মনে হলো। এতো কষ্ট করে খাওয়া দাওয়া করাটা আমার বিশেষ পছন্দ হলো না। আমার মনে হলো এখান থেকে ভেগে যাওয়াই ভালো আর ভেগে গিয়ে কোনো একটা হোটেলে বসে এজিএম খাচ্ছি ভেবে নিলেই হলো। আমি যখন এসব ভাবছি তখন দেখলাম একজন চোখ কুচকে ভীম বেগে আমার দিকে তেড়ে আসছে। নিঃসন্দেহে আমার সাথে মারামারি করে আমার খিদেটা উসকে দেয়ার ইচ্ছে তার। আমার ইচ্ছে হলো তাকে বলি যে এজিএম আমি খাবো না, সে বরং অন্য কাউকে বেছে নিক। কিন্তু আমার মনে হলো এতো কিছু বলার সময় আমি পাবো না, তার আগেই সে আমার উপরে আছড়ে পড়বে। তখন আমি শান্তভাবে ডান হাতটা তাকে থামানোর ভঙ্গিতে তুলে দাঁড়ালাম। সে দৌড়ে এসে আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে বললো, "কি?"

"আমি এজিএম খাবো না।"

বলে আমি ঘুরে ঝেড়ে দিলাম এক দৌড়। এক দৌড়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে গলির মাথায় এসে দেখি ওবায়েদ আমার আগেই সেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তার জামা কাপড় জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়েছে, মুখ ফুলে গেছে, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। বললাম, "তুই এখানে? মুন্না কোথায়?"

"কি করে বলি?" যেনো স্রষ্টা বিষয়ক কোনো প্রশ্ন করার হয়েছে এমন নির্লিপ্ত উদাস স্বরে জবাব দিলো ওবায়েদ।

"বেড়ে খাওয়ালি যা হোক। এরকমও হয় নাকি?"

"হয়। কতো কিছুই হয়। আজকাল এজিএম মানেই মারামারি।"

"সে আবার কি? কেনো?"

"ডিভিডেন্ড নিয়ে গণ্ডগোল লাগে। কোম্পানি থেকে যে ডিভিডেন্ড দেয় দেখা যায় ডিভিডেন্ড পাওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি। তখন সবাই বেশি দাবি করে কিন্তু কোম্পানি দেয় না। এই নিয়ে শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় আবার যে উপহার দেয় সেটা পছন্দ হয় না। এইসব নিয়েই গণ্ডগোল বাঁধে।"

"বেড়ে অবস্থা বটে..."

বলতে বলতে আমি মুন্নাকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখলাম। থেমে গিয়ে আমি অবাক চোখে চেয়ে রইলাম। সে সত্যিই দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। দারুণ দেখাচ্ছে তাকে। তার জামা কাপড় যে কতো জায়গায় ছিঁড়েছে আল্লাই জানে। তাকে দেখে মনে হলো ছেড়া নেকরার একটা স্তূপ সে। দু'হাতে দুটো দলা পাকানো প্যাকেট নিয়ে সে ছুটে আসছে। কাছে এসে প্যাকেট দুটো দেখিয়ে বললো, "হে হে, দুটো জোগাড় করতে পেরেছি। আরে ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে নাকি? খেতে এসে আমরা না খেয়ে চলে গেলে ওরা মন খারাপ করবে না?"

শেয়ার ব্যবসার ডামাডোলে পড়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালোই হচ্ছে বলে মনে হলো। আমাদের স্বীকার করতে হলো যে লাভ হোক বা না হোক ব্যবসাটা উত্তেজনাপূর্ণ। উত্তেজনাটা আরো বাড়াতে আর আমাদের অভিজ্ঞতার ভাড়ার পূর্ণ করতে আমরা ঠিক করলাম আমরা চট্টগ্রাম যাবো। চট্টগ্রামেও স্টক এক্সচেঞ্জ আছে আর এবার আমরা সেখানে আমাদের দুঃসাহসিক অভিযান চালাবো। আমাদের সাহসী অভিযানে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ যদি উড়ে যায় তো যাবে।

না, ব্যাপারটা আমরা এমন হঠাৎ করে ঠিক করিনি। আসলে মুন্নাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতেই আমাদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে হলো। মুন্না টিসাইয়ের শেয়ার কেনার পর কয়েকদিন সেটার দাম ক্রমাগত বেড়ে গেলো। চাইলে মুন্না সাতশো টাকা করে বিক্রি করে দিতে পারতো, তাতে তার সাতাশ হাজার টাকা লাভ হতো। কিন্তু দু' হাজার, বা নিদেন এক হাজার পর্যন্ত শেয়ারটার দাম উঠবে এই ধারণায় সে বিক্রি করলো না। কিন্তু এরপর দাম কমতে শুরু করলো। পরপর কয়েকদিন এক সাথে সবকটা কোম্পানির দাম কমে গেলো। শেয়ার বাজার জমে উঠতে শুরু করার পর সাধারণত পরপর দু' দিনের বেশি দাম কমেনি। দু' দিন কমেই আবার বাড়তে শুরু করেছে এবং বাড়তে শুরু করে দু' দিনে যা কমেছে তার চেয়ে ঢের বেশি বেড়েছে। কিন্তু এবার এক নাগাড়ে ক্রমাগতই দাম পড়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে একদিন দাম বাড়ে, কিন্তু যা

বাড়ে কমে তার চাইতে ঢের বেশি। টিসাইয়ের দাম পরপর কয়েকদিন কমে তিনশোতে চলে গেলো। তারপর সেটা তিনশো থেকে সাড়ে তিনশোর মধ্যে ওঠানামা করতে লাগলো।

অবস্থা দেখে মনে হলো শেয়ার বাজার বসে যাচ্ছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। কার্ব মার্কেটে মানুষজন অস্থির শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। চারদিকে আতঙ্কিত কথাবার্তা। সবাই আতঙ্কিত হয়ে যার যার শেয়ার বেচে দিতে চাইলো কিন্তু কেউ কিনতে চাইলো না। ফলে চারদিকে হাহাকারের মতন শুরু হয়ে গেলো।

মুন্নার শেয়ার সাতশো টাকা পর্যন্ত উঠে যখন কমতে শুরু করলো তখন মুন্না বললো যে সমস্যা নাই আবার বাড়বে। দামটা যখন ছশো টাকায় নেমে এলো তখন সে বললো সাতশো টাকায় বিক্রি করেনি ছশোতে কেনো করবে। এরপর দাম যখন পাঁচশোতে নেমে গেলো তখন হায় হায় করতে লাগলো কেনো সাতশো টাকায় বিক্রি করেনি। সাতশো টাকায় বিক্রি করলে যে টাকা পেতো এখন পাঁচশো টাকায় বিক্রি করলে তার চাইতে বিশ হাজার কম পাবে। এ কি সহ্য করা যায়? না, এতো লস সে সহ্য করতে পারবে না। তারচেয়ে আরো অপেক্ষা করা ভালো। এরপর দাম যখন চারশোতে নামলো তখন মুন্না বললো, "হায় হায়, এতো আমার কেনা দামের চেয়ে কম! এখন আমি কি করি?" দামটা যখন তিনশোতে গিয়ে ঠেকলো তখন মুন্না, না, সে কিছুই বললো না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ ডুকরে উঠে বললো, "ওরে গেলো রে গেলো, আমার সব গেলো।"

প্রথম থেকেই আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সব শেয়ারের দাম ঢাকার চেয়ে বেশি। অনেকে ঢাকা থেকে শেয়ার কিনে চট্টগ্রামে নিয়ে বিক্রি করে। পত্রিকা খুলে দেখলাম চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে টিসাইয়ের দাম তখনো চারশো আশি টাকা। মুন্না টিসাই কিনেছে চারশো একুশ টাকা করে। যদি সে চট্টগ্রামে গিয়ে সাড়ে চারশোতেও বিক্রি করতে পারে তবে এখনও তার লাভ হবে। মুন্না বললো লাভের তার দরকার নেই। যে টাকা দিয়ে কিনেছে কোনোমতে সেটা তুলে নিতে পারলেই সে কানে ধরবে।

"ঘাট হয়েছে বাবা। এই কানে ধরছি, শেয়ার বাজারে আর না। এখন এটা বিক্রি করে দিতে পারলে বাপ বাপ বলে যে একখান দৌড় দিবো, আর ফিরবো না।"

রাত এগারোটায় আন্তঃনগর ট্রেন 'তূর্ণা নিশিথা' চট্টগ্রাম যায়। মানে এগারোটার সময় সেটা কমলাপুর স্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

আমরা এই ট্রেনে চট্টগ্রাম যাবো। রাত সাড়ে নয়টায় আমি মেস থেকে বের হলাম। গলি থেকে বের হওয়ার সময় উপরে চেয়ে দেখি, মায়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি, সে জানে। আমি আধো আলো আধো ছায়ায় বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলাম। সে অন্ধকারে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। আমি গলি থেকে বের হয়ে পড়লাম।

রাস্তার মোড়ে মুন্না দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা কমলাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা ট্রেনে করে চট্টগ্রাম যাবো, অথচ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কেউ আমাদের চোখের জলে বিদায় জানাবে না, বিষয়টা আমাদের ভালো লাগছিলো না। বিদায় জানাবার জন্য শওকতকে আমরা পাকড়াও করে নিলাম। কিভাবে আমাদের চোখের জলে বিদায় জানাতে হবে সেটা আমরা ওকে ভালো করে শিখিয়ে দিলাম, যদিও আমার ক্ষীণ সন্দেহ হচ্ছিলো যে শওকত ব্যাপারটা আদৌ করতে পারবে কিনা। চোখের জল জিনিসটা শওকতের সাথে ঠিক যায় না। চোখে পানি আনার জন্য যতটুকু সংবেদনশীলতা থাকা দরকার ততটা তার নেই। তাই আমরা তাকে বলে দিলাম যে চোখে পানি আনতে না পারলে আমরা তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নীচে ফেলে দিবো।

আমরা স্টেশনে গিয়ে জানতে চাইলাম এগারোটার ট্রেন কয়টায় ছাড়বে। ওরা বললো এগারোটার ট্রেন এগারোটাতেই ছাড়বে। আমরা আবার জানতে চাইলাম কবেকার এগারোটার ট্রেন আজকে এগারোটায় ছাড়বে। ওরা বললো যে এ বিষয়টা নিয়ে তারা নিশ্চিত না। প্লাটফর্মে একটা ট্রেন পড়ে আছে আর সে ট্রেনটা এগারোটায় যাবে বলেই তাদের ধারণা। তবে সে ট্রেনটা আজকের কিনা সেটা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আমরা তখন নিজেদের বললাম যে এগারোটায় একটা ট্রেন গেলেই হলো। কবেকার এগারোটার ট্রেন সেটা নিয়ে আমরা মাথা নাই বা ঘামালাম।

ট্রেনটা প্লাটফর্মে একটা শান্ত শিষ্ট শুয়ো পোকার মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা গিয়ে ওটার পাশে দাঁড়ালাম। মুন্না মাঝে মাঝে ট্রেনে করে তার গ্রামের বাড়ি যাওয়া আসা করে বলে ট্রেন নিয়ে তার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। জ্ঞান বিতরণের ভঙ্গিতে সে সেইসব অভিজ্ঞতার বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছিলো। এগারোটা বাজতে ট্রেনটা নড়ে উঠলো। আমরা দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম। শওকত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় জানিয়ে হাত নাড়লো। উত্তরে মুন্না প্রথমে হাত নাড়লো, তারপর পা নাড়লো, তারপর উল্টোদিক হয়ে দু'হাতে ট্রেনের দুই হাতল ধরে নিতম্বটা বাইরে বের করে এদিক ওদিক দোলাতে লাগলো।

ভিতরে ঢুকে আমরা আমাদের সিট খুঁজে বের করলাম। আমাদের সিট পড়েছে মুখোমুখি আর আমাদের দুজনেরই পাশে এখন পর্যন্ত কেউ নেই। এমন ফাঁকা সিট পেয়ে আমরা খুশি হয়ে উঠলাম আর কামনা করলাম গোটা যাত্রাপথটা যেনো এমনই থাকে। মুন্না বললো তার পাশে কেউ বসলে তাকে তুলে সে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিবে। তবে যদি কোনো সুন্দরী রূপবতী মেয়ে এসে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে সে আমাকেই ছুড়ে ফেলে দিবে।

"বুঝলি, কেনো জানি না মনে হচ্ছে আজ একটা কিছু হবেই। মনে হচ্ছে কোনো না কোনো অপ্সরা আজ পাশে বসবেই। একবার একটা অপ্সরা এসে বসতে দে না পাশে, তারপর দেখবি। না, তুই দেখবি কি করে? তোকে তো আগেই জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিবো।"

"এতো রাতে একলা একটা মেয়ে এসে তোর পাশে বসে পড়বে বলছিস?"

"কেনো, সে রকম হতে দোষ কি? নাটক সিনেমায় তো আকছার হচ্ছে, বাস্তবে যদি হয় তাহলে সমস্যা কোথায়? ধর দারুণ সুন্দরী এক মেয়ে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে। কোথায় যাবে সে জানে না। মনের দুঃখে চোখের পানি মুছতে মুছতে সে ট্রেনে উঠে আমার পাশে এসে বসলো। তখন কি হবে বলতো?"

"শুধু সুন্দরী হলেই হবে? বড়লোক হতে হবে না?" আমি মুন্নার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলাম।

"অবশ্যই বড়লোক হতে হবে। কোটিপতি বাপের একমাত্র মেয়ে হতে হবে। আর একটু ট্যারা হতে হবে।"

শেষের শর্তটা আমি ভালো করে বুঝলাম না। বিস্মিত হয়ে বললাম, "ট্যারা কেনো হতে হবে?"

"আরে ট্যারা না হলে কোটিপতির রূপবতী মেয়ে আমাকে পাত্তা দিবে কেনো? হো হো হো..."

মুন্না এরকমই। হাতে কোনো কাজ না থাকলে কোটিপতির প্রতিবন্ধী মেয়ে খোঁজা তার একটা শখ। কবে যেনো কোন বাংলা সিনেমায় সে এরকম একটা কাণ্ড দেখেছিলো। কোটিপতি বাবার একমাত্র কিন্তু অন্ধ মেয়ের জন্য একই শ্রেণীর পাত্র পাওয়া যাচ্ছিলো না বলে বাবা পাত্র চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন। পাত্র বেকার, গরীব বা যাই হোক সমস্যা নেই, শুধু একটু শিক্ষিত হলেই চলবে। সেই সিনেমা দেখার পরই মুন্নার মাথাটা গেলো বিগড়ে। মাঝে মাঝেই সে গুলশানের ধনী পাড়ার নিরিবিলি সব বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে

হাঁটতে চিৎকার করে- আছেন কোনো কোটিপতি বাবার একমাত্র প্রতিবন্ধী মেয়ে, এখানে সুদর্শন শিক্ষিত যোগ্য পাত্র হেঁটে যায়...

ভরসা একটাই, চিৎকারটা সে করে মনে মনে।

রাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেনটা ছুটে চলছিলো। অগ্রহায়ণের এই শেষটায় যদিও তেমন শীত পড়েনি, কিন্তু ট্রেনের কামড়া ঠাণ্ডা হয়ে শীত করতে শুরু করেছে। ট্রেনের বুফে থেকে চা ফেরি করে বেড়াচ্ছিলো। গরম চায়ের ধোঁয়া উঠতে দেখে আমি খপ করে একটাকে পাকড়ে ধরলাম। কাপটা মুখের কাছে তুলে চুমুক দিতেই বোটকা একটা গন্ধ ধক করে ধাক্কা মেরে আমাকে উল্টে ফেলে দিলো। মুন্নার দিকে চেয়ে দেখি সে নিঃশব্দে হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমি তাকাতে নিঃশব্দ হাসি বাদ দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললো, "গন্ধটা কেমন বল?"

"পচা কাদার।"

"বলেছিলাম কি না?"

আমাকে স্বীকার করতে হলো যে এ বিষয়ে মুন্না আমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো। ট্রেনের চা সম্পর্কে সাবধান করে সে বলেছিল, "খবরদার ট্রেনে চা খাবি না। লাশ ঢাকার চা পাতি দিয়ে ট্রেনের চা বানায় আর সেটা থেকে পচা কাদার গন্ধ বের হয়।"

পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই মুন্না নিজের সিট ও পাশের সিট দুটোই দখল করে শুয়ে পড়ে নাক ডাকতে লাগলো। তার নাক ডাকাটা ছিলো কৃত্রিম আর তাই শব্দটা খুব বেশি হচ্ছিলো। শব্দের চোটে আশে পাশের যাত্রীরা উঠে এসে তাকে দেখতে লাগলো। আমি তাদের বলে দিলাম যে বেচারার ছোট বেলায় ভূতের ভয় খুব বেশি ছিলো, তার মা তাকে শিখিয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে নাক ডাকলে শব্দে ভূতেরা ভয় পেয়ে কাছে আসে না। সেই থেকে জোরে জোরে নাক ডাকাটা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। শুনে মুন্না এক চোখ একটুখানি খুলে হাতের ফাক দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলো আর লোকগুলো সহানুভুতিতে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলো।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে এক ভদ্রলোক উঠে তার সিটে শুয়ে মুন্নাকে নাক ডাকতে দেখলেন। তিনি প্রথমটায় মৃদু স্বরে মুন্নাকে ডাকলেন। এতে করে মুন্নার নাক ডাকার শব্দ আরো বেড়ে গেলো। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। আমি জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলাম যেনো ভিতরে কি হচ্ছে আমি তার কিছু জানি না; মুন্নাকেও আমি জীবনে কখনো দেখিনি। তিনি আবার আরেকটু উঁচু স্বরে ডাকলেন। মুন্নাও তার সাথে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকার

শব্দ বাড়িয়ে দিলো। ভদ্রলোক তখন গলা উঁচু করে বললেন, "এই, এই ছেলে, ওঠো..."

মুন্না হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়লো, "এ্যাঁ কে? কি? কি হয়েছে? ডাকাত পড়লো নাকি?"

"না ডাকাত পড়েনি।" ভদ্রলোক বললেন।

"ও ডাকাত পড়েনি? তাহলে ঘুমাই।" বলে মুন্না আবার শুয়ে পড়লো। ভদ্রলোক এবার মুন্নাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "উঠে বসো। তোমার পাশের সিটটা আমার।"

মুন্না বিরস বদনে উঠে বসলো। তারপর ব্যাজার মুখে একেবারে নিজের সিট ছেড়ে আমার পাশে এসে বসলো। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললো, "কোথায় কি উঠবে রূপবতী অপ্সরা, তা না উঠলো এক হোঁদল কুতকুত।"

এরপর আর তেমন কোনো উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটলো না। ট্রেনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো ঠাণ্ডা, শব্দ আর দুলুনি। রাত যতো বাড়তে লাগলো ঠাণ্ডা তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চললো। ঠাণ্ডায় আমাদের লেজে গোবরে অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। ঠাণ্ডার চোটে আমাদের উত্তেজনা মিইয়ে গিয়ে আমরা চুপসে গেলাম। এরমধ্যে অন্ধকার প্রকৃতির ভিতর দিয়ে চলতে গিয়ে ট্রেনটা ভয়ানক শব্দ করছিলো আর সাংঘাতিক দুলছিলো। ট্রেনটা দুলতে দুলতে এমন বিচিত্র শব্দ করে ছুটছিলো যে প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিলো এখনই সেটা লাইন ছেড়ে উল্টে যাবে। সত্যি বলতে কি শব্দটা এমন ছিলো যে আমি ট্রেনটা উল্টে যাওয়ার জন্য বসে রইলাম আর প্রতি মুহূর্তে এখনও সেটা উল্টায়নি দেখে অবাক হচ্ছিলাম। আমি মুন্নাকে বললাম ট্রেনটা নিশ্চয় তিন-চারশো কিলোমিটার গতিতে চলছে। মুন্না বললো বড়জোর সত্তর কিলোমিটার। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

ভোরবেলা আমাদের ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনে প্রবেশ করলো।

নয়

ট্রেনটা উল্টে না গিয়ে ঠিকঠাক মতো চট্টগ্রাম পৌঁছে গেছে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তারপর ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়লাম। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত পা টান করে আমরা শরীরের জড়তা ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম, এমন সময় কে যেনো চেঁচিয়ে উঠলো, "যাসনে, তোরা যাসনে।"

আমরা তাকিয়ে প্লাটফর্মের একটা থাম্বার কাছে পাগল ধরণের একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তার তালি দেয়া মোটা চটের জামা কাপড়, মাথায় বহুদিনের পুরনো জটাচুলের বাসা। বড় বড় দাঁতগুলো হলুদ আর চোখ দুটো লাল। আমরা তাকাতে সে আবার হুংকার দিয়ে বললো, "যাসনে, তোরা যাসনে।"

আমরা বললাম যে আমরা যাচ্ছি না, আমরা আসলাম।

"যাসনে খবরদার। তোদের ভালো হবে না। ফিরে যা, ফিরে যা বলছি।"

আমরা ধন্দে পড়ে গেলাম। স্পষ্টতই সে আমাদেরকেই বলছে। মতলবটা কি তার? আমাদের ফিরে যেতে বলছে কেনো? তার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে নাকি? সেই ক্ষমতার বলে সে খারাপ কিছু দেখতে পেলো?

আমরা কাছে গিয়ে বললাম, "কি হয়েছে? ফিরে যাবো কেনো?"

সে কিছুক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ঘুরে হন হন করে হেঁটে চলে গেলো।

"লে বাবা।" মুন্না বললো। "এটা কি হলো? বেটার আসলেই কোনো ক্ষমতা আছে নাকি আমাদের ঢপ দিয়ে গেলো?"

"ঢপ দিয়ে গেলো।"

"কিন্তু তার মতলবটা তো বুঝলাম না। কেনো ঢপ দিলো?"

"সেটাই তো কথা..."

আলোচনা করতে করতে আমরা স্টেশনের গেটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ সেই জটাচুলের বাসা কোথা থেকে লাফ দিয়ে পড়লো আমাদের সামনে।

আমরা চমকে লাফিয়ে উঠলাম। লোকটা তার হলুদ দাঁত বের করে আমাদের মুখের কাছে মুখ এনে বললো, "গেলে মরবি।"

আমরা তাকে দেখতে দেখতে স্টেশন থেকে বের হয়ে গেলাম। স্টেশন থেকে বের হয়ে এক হোটেলে নাস্তা করলাম। এখানকার স্টক এক্সচেঞ্জ কোথায় আমরা জানি না। হোটেল থেকে বের হয়ে এক রিকশাঅলাকে বললাম আমরা শেয়ার বাজারে যাবো।

সে এক বাক্যে চিনে গেলো। বললো, "ওঠেন।"

রিকশাটা আমাদের নিয়ে ছুটে গেলো। শেয়ার বাজারে পৌঁছে দেখি লোকজন তেমন নেই। অল্প কয়েকজন মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমরা পাশের এক চায়ের দোকানে বসলাম। দোকানি চট্টগ্রামের বাংলায় কি যেনো জিজ্ঞেস করলো আমরা এক বর্ণ বুঝলাম না। তখন সে আমাদের বোধগম্য বাংলায় বললো, "ঢাকা থেকে আসলেন নি আপনেরা?"

"হ্যাঁ।"

"শেয়ার বেচতে?"

"হ্যাঁ।"

"প্রতিদিন কতো মানুষ আসে ঢাকা থেকে শেয়ার বেচতে। কয় মাস ধরেই খালি এই চলতেছে।"

"তাই নাকি? অনেকদিন ধরেই আসে?"

"তা আসে। মানষের মুখে এখন তো শেয়ার ছাড়া কথা নাই। সবাই শেয়ার ব্যবসা করতেছে।"

"হ্যাঁ ঠিকই। কিন্তু এখানে তো লোকজন দেখছি না।"

"দেখবেন, আরেকটু বেলা হলেই দেখবেন। একেবারে বিজয় মেলা বইসা যাইবো। বিজয় মেলা দেখছেন নি? বিরাট ভিড়। এইখানেও ঐ রকম ভিড় বইসা যাইবো।"

বিজয় মেলা বসতে দেরি হবে বলে মনে হলো। আমাদের এই প্রথম চট্টগ্রাম আসা। মেলা বসার আগে আমরা চট্টগ্রামটা একটু ঘুরে ফিরে দেখতে বের হলাম। রিকশা নিয়ে চট্টগ্রামের চড়াই উতরাইয়ের রাস্তা পেরিয়ে আমরা ফয়েজ লেকে পৌঁছে গেলাম। সেখানে গিয়ে মুন্না এক কাণ্ড করে বসলো। টিলার উপরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে ফয়েজ লেকের সৌন্দর্য দেখছিলাম। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু নীচু টিলার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে স্বচ্ছ পানির এক লেক। সবুজে মাখানো টিলার মাঝ দিয়ে পানির প্রবাহধারা। আশ্চর্য সুন্দর সে দৃশ্য। এরকম সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে বুকের ভিতরে হাহাকার করে ওঠে।

আশ্চর্য এক তুচ্ছতার অনুভূতি জেগে ওঠে মনের মধ্যে। মনটা শান্ত হয়ে যায় আর সব বাদ দিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে শান্ত নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। প্রকৃতির রূপ, মাধুর্য আর কোমলতা আমাদের শান্ত করে, উদার করে। আমাদের মধ্যে মহৎ চেতনা জাগিয়ে তোলে। অথচ মানুষের সভ্যতা আমাদের অস্থির করে। আমাদের উন্মাদ করে তোলে। আমরা অস্থিরচিত্তে উন্মাদ হৃদয়ে সভ্যতার বিচিত্র ইঁদুর দৌড়ে সামিল হই। আমরা নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। ক্ষুদ্রতম সব বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি করি, একে অপরের সাথে মারামারি করি। জগতের সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমরা কামড়া কামড়ি করি। পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে একেকটা ভাগ কে আমরা শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করি আর তারপর গিয়ে অন্য ভাগগুলোকে আক্রমণ করি। এই ভাগগুলোকে আমরা বলি দেশ। এইসব ভাগাভাগির ডামাডোলে আমাদের চিন্তা চেতনা ক্ষুদ্র থেকে আরো ক্ষুদ্র হয়ে যায়। আমরা যেমন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে বুঝি না, তেমনি আবার নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশ বুঝি না। অন্যেরটা চুরি করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিজেকে বড়লোক বলতে আমাদের যেমন বাঁধে না, তেমনি নিজের দেশকে শ্রেষ্ঠ বলতে আমাদের আটকায় না। বরং সেটাতেই আমরা গর্ববোধ করি। আমরা পৃথিবী নিয়ে গর্ব করি না, দেশ নিয়ে গর্ব করি। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বাধিয়ে অন্য রাষ্ট্রের মানুষ হত্যা করে নিজেদের আমরা দেশপ্রেমিক ও বীর বলে আখ্যায়িত করি। তারপর সেই দেশপ্রেম ও বীরত্ব নিয়ে কবিতা, গান আর মহাকাব্য লিখতে বসে যাই। হ্যাঁ, এসবই আমরা করি। হাজার হাজার বছর ধরে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমরা নিজেদের এভাবেই গড়ে তুলেছি। এইরকম ক্ষুদ্র চিন্তা সম্পন্ন, বর্বর, দেশপ্রেমিক, অসহিষ্ণু আর স্বার্থপর। আর আমরা এটার নাম দিয়েছি- সভ্যতা।

দুঃখিত, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ফয়েজ লেকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এসবই আমার মনে আসছিলো ফলে মুন্নার কথা আমার মনে ছিলো না। হঠাৎ মনে হলো- মুন্নার হলো কি?

ঘুরে দেখি মুন্না নির্বাক নিষ্পলক দৃষ্টিতে নীচে লেকের দিকে চেয়ে আছে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে আমি একটা হোঁচট খেলাম। আমাদের টিলার নীচে লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে বালতিতে পানি তুলে গোসল করছে এক চাকমা তরুণী। তরুণী চাকমাই কিনা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না, তবে দূর থেকে দেখে সেরকম মনে হলো। তার কাপড়টা পাতলা আর পানিতে ভিজে কাপড়টা শরীরের সাথে লেপটে গিয়ে তার দেহ সৌষ্ঠব বেশ মূর্ত ভাবে ফুটে উঠেছে।

মুন্না পলকহীন চোখে একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রয়েছে। দেখে আমি আঙুল দিয়ে ওর পেটে একটা গুঁতো মারলাম। সে বিড়বিড় করে বললো, "সুন্দর বটে তব অঙ্গ দু'খানি তারায় তারায় খচিত।"

আমার রাগ হয়ে গেলো। হারামজাদার কাব্যরস উথলে পড়ছে। ওর কানে ধরে বললাম, "মগা, ওটা অঙ্গ দু'খানি না, অঙ্গদ খানি।"

মুন্না রেগে বললো, "যা যা, তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। ভারি তো আমার বিদ্যে, তার আবার অঙ্গদ খানি!"

বিজয় মেলা জমে উঠেছে। দুপুরের দিকে মেলায় ফিরে আমাদের মনে হলো আমরা বিজয় মেলায় না, শর্ষে ফুলের মেলায় হাজির হয়েছি। মুন্না আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললো, "বিজয় মেলার জন্ডিস হয়েছে বুঝলি। দেখ চারদিকটা কেমন হলুদ হয়ে গেছে।"

বাস্তবিক অবস্থাটা তাই। সবার হাতে হাতে টিসাইয়ের শেয়ার। টিসাইয়ের শেয়ারের রং হলুদ। হলুদে সয়লাব পুরো কার্ব মার্কেট। ঢাকায় টিসাইয়ের দাম তিনশ পঞ্চাশ, এখানে চারশো আশি। মনে হচ্ছে সব টিসাইয়ের শেয়ার এখানে চলে এসেছে। আমরা বাজারে ঢুকলাম। কিন্তু বাজারের অবস্থা খারাপ। মানুষজনের মুখ থমথমে। লোকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু কেউ দামাদামি করছে না। একই অবস্থা আমরা দেখে এসেছি ঢাকাতেও। মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে আতঙ্ক।

মুন্না ব্যাগের মধ্যে থেকে ওর শেয়ার বের করলো। শেয়ার হাতে নিয়ে আমরা একপাশে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই রইলাম, কেউ একবার এসে দামটাও জানতে চাইলো না। বরং কয়েকজন থমথমে মুখে ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখে গেলো। ভাবসাব দেখে আমাদের ভালো লাগছিলো না। আমাদের স্টেশনে দেখা সেই জটাচুলের কথা মনে পড়ে গেলো। মুন্না ওর শেয়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো। আমরা একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। দুপুরের পর জানা গেলো আজকেও সব শেয়ারের দাম কমেছে। মানুষজনের মুখ আরো থমথমে হয়ে গেলো।

হঠাৎ একজন এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। আমরা তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। সে নীচু গলায় বললো, "আপনারা ঢাকা থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, চলে যান। এখানে থাকলে মার খাবেন। কালকেও এখানে কয়েকজনকে মেরেছে।"

আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, "মেরেছে?"

"হ্যাঁ। সাংঘাতিক মার দিয়েছে। শেয়ার কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। এখানে থাকলে আপনাদেরও মারবে। এখনি চলে যান। এক কাজ করেন, আমার সাথে আসেন।"

আমরা তার সাথে হেঁটে শেয়ার বাজার থেকে বের হয়ে এলাম। বাজারের সবগুলি মুখ আমাদের দিকে চেয়ে ছিলো। সেই ব্যক্তি আমাদের বের করে নিয়ে এসে রাস্তার অন্যপাশের ফুটপাতে দাঁড়ালো। বাস স্ট্যান্ডে যাবার জন্য একটা রিকশা ঠিক করলাম আমরা। সেই ব্যক্তি বললো, "অবস্থা খুব খারাপ বুঝলেন ভাই। মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে। কতজন কতো টাকা বিনিয়োগ করছে, সব এখন ধরা। সব টাকা পানিতে গেছে। দাম আর বাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। মানুষের মাথা সমানে গরম হয়ে উঠছে। কালকে ঢাকা থেকে আসা কয়েকজনকে ধরে খুব মেরেছে। সবার শেয়ার কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আপনাদের কতো গেছে?"

"পঞ্চাশ হাজারের মত।"

"কমই গেছে। অনেকের সর্বস্ব যাচ্ছে রে ভাই। এতো দ্রুত দাম পড়ে গেলো যে কিছু বোঝাই গেলো না। আমার কতো গেছে জানেন?"

"কতো?"

"সাড়ে বারো লাখ। কি করে যে টাকাটা জোগাড় করেছিলাম আমিই জানি। প্রথম দিকে ভালোই লাভ হয়েছিলো। এখন অবস্থা যা হয়েছে তাতে দাম না বাড়লে পথে বসতে হবে।"

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কার্ব মার্কেটের দিকে চেয়ে দেখি মানুষগুলো রাগে ফুঁসছে। এরা নাকি কালকে কয়েকজনকে মেরেছে। শেয়ার ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দিয়েছে। কতো স্বপ্ন, কতো আশা মিশে ছিলো ঐ শেয়ারগুলোর মধ্যে। কার্ব মার্কেটে যারা ব্যবসা করতে আসে তারা বেশিরভাগই খুব সাধারণ মানুষ। তারা কেউই খুব বড় কিছু তো না। অনেকে এই শেয়ার বাজারে এসে জীবনে প্রথম সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখেছে। অনেক বেকার এই ব্যবসা করে টিকে থাকতে চেয়েছে। সেই স্বপ্নগুলোকে ওড়া ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সেই যে ঢাকায় একজনের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিলো, যে তার মায়ের চিকিৎসার জন্য একটু একটু করে টাকা জমাচ্ছিলো। জমানো দু' লাখ টাকা নিয়ে শেয়ার বাজারে চলে এলো চিকিৎসার বাকি টাকাটা এখান থেকে উঠিয়ে নিবে বলে, তার আশাটাও কি ড্রেনের মধ্যে ভেসে গেলো? অথবা সেই মানুষটা, এক্সিডেন্টে পা হারানোর ফলে যে চাকরিটাও হারিয়েছে, স্ক্র্যাচে ভর দিয়ে যে শেয়ার বাজারে ব্যবসা করতে আসে, তার বেচে থাকার লড়াইটাও কি এভাবে

হারিয়ে গেলো? অথচ যারা মারলো আর যারা মার খেলো তারা সবাই তো একই দলের খেলোয়ার। তবে? নিজেদের দিয়ে আমরা জানি, শেয়ারের দাম কমা-বাড়ায় কার্ব মার্কেটের মানুষগুলোর প্রভাব কতো সামান্য, কতো ক্ষুদ্র। অথচ...

ওপাড় থেকে কয়েকজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। রাস্তার মাঝামাঝি থাকতেই তারা চিৎকার করে আমাদের বললো, "এই আপনেরা এদিক আসেন।"

আমাদের সেই ব্যক্তি বললো, "তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠে বসেন, যান।"

আমরা লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে বসলাম। রিকশাঅলা কিছু টের পেয়েছিলো, সে তীর বেগে রিকশা চালিয়ে দিলো। কিছুদিন আগে এক রিকশাঅলা তীর বেগে রিকশা চালিয়ে আমাদের নিয়ে শেয়ার বাজারে ঢুকে পড়েছিলো। আজ আরেক রিকশাঅলা একইভাবে আমাদের শেয়ার বাজার থেকে বের করে নিয়ে এলো।

দৃশ্য

আবার ফিরে আসে আরেক অগ্রহায়ণ। বাতাসে হেমন্তের সোনা রোদের গন্ধ ভাসে। একদিন ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টিয়ে চমকে উঠি। এক বছর আগে এই তারিখে আমরা চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসেছিলাম। তারপর আমরা আর শেয়ার বাজারে যাই নি। শেয়ারের দাম আর বাড়েনি। দাম বাড়বে এই আশায় বসে থেকে থেকে মুন্নার শেয়ারটা আর বিক্রি করাই হলো না। সে সত্যিই শেয়ারটা বাঁধিয়ে ঘরে টানিয়ে রেখেছে। এই এক বছরে আমরা পত্রিকায় দেখেছি শেয়ার বাজারে সর্বস্ব হারিয়ে কতো মানুষের আর্তনাদ।

অনেকদিন পর মতিঝিলে স্টক এক্সচেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখন এখানে কার্ব মার্কেট নেই। সেল সেল বলে চিৎকার নেই। নেই আনন্দিত কোলাহল। শেয়ার বাজারকে ঘিরে সেই প্রাণ চাঞ্চল্যের কিছুই আর নেই। যে মানুষগুলো একদিন এ জায়গাটা আনন্দিত কোলাহলে মুখর করে তুলেছিল, আবার সর্বস্ব হারিয়ে আর্তনাদ করেছিলো, তাদের কেউ এখন আর এখানে নেই।

মতিঝিল থেকে ফিরতি পথ ধরে হাঁটতে থাকি। বিকেলের আলো মরে এলো প্রায়। হেমন্তের একেকটা বিকেল আমার কাছে সোনার খনির চেয়েও দামি বলে মনে হয়। কি আশ্চর্য অদ্ভুত আলো চারদিকে। কি অপূর্ব তার রূপ। সেই আশ্চর্য অদ্ভুত আলো গায়ে মেখে আমি তার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাই। হেমন্তের আশ্চর্য বিকেল ধীরে ধীরে মরে যায়। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি বিকেলের মৃত্যু। কি বিষণ্ন তার ফুরিয়ে যাওয়া!

সমাপ্ত

মাহবুবুর শাহরিয়ার

দেশ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর। গ্রামের নামটা মজার- পুকুরপাড়। তবে শাহজাদপুর বা পুকুরপাড় থাকা হয়নি কখনো। বাবা সরকারী চাকুরে, সেই সূত্রে শৈশব কেটেছে দেশের বিভিন্ন জেলায়। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা। অবশেষে নটরডেম কলেজ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। লেখালেখির শুরু ২০০৮ এ। প্রথম প্রকাশিত বই ২০০৯ এর একুশের বইমেলায় বিদ্যাপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত উপন্যাস ‘প্রেম ও অনুভব’। ‘বিকেলের মৃত্যু’ লেখকের চতুর্থ উপন্যাস।